গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৭ বর্ষ ১ সংখ্যা | ২ - ৮ আগস্ট ২০২৪ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

রাজনীতি, সমাজনীতি ও বিজ্ঞানসাধনার ওপর ধর্ম চাপালে তা সমাজপ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করে

শিবদাস ঘোষ

৫ আগস্ট মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের ৪৯তম স্মরণদিবস। এই উপলক্ষে তাঁর অমূল্য শিক্ষা থেকে একটি অংশ প্রকাশ করা হল।

"... বহু মানুষ আছেন, যাঁরা মনে করেন, মানবতাবাদী চিন্তা মানুষের মধ্যে আগাগোড়াই ছিল। তাঁদের ধারণা, মানুষের কল্যাণের জন্য যাঁরাই চিন্তা করেছেন— অর্থাৎ বুদ্ধের চিন্তাধারা, যিশুর চিন্তাধারা, মহম্মদের চিন্তাধারা, উপনিষদের ভাবনাধারণাগুলোর মধ্য দিয়ে মানুষের কল্যাণের যা কিছু চিন্তা করা হয়েছে— এঁদের সকলেরই চিন্তাধারায় মানবতাবাদী চিন্তাধারা প্রতিফলিত হয়েছে। এ ভাবে যাঁরা মনে করেন, আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই।

মানুষের কল্যাণের জন্য যেহেতু এঁরা সকলেই চিন্তা করেছেন, সে জন্য সেগুলোকে আমরা মানবিক চিন্তা বলতে পারি। মানুষের কল্যাণের জন্য চিন্তা মানেই মানবতাবাদ নয়। মানবতাবাদ বলতে একটা বিশেষ আদর্শগত, রুচিগত, নীতিগত, এথিক্যাল একটা ক্যাটিগরি, বিচার-বিবেচনার এবং ধ্যান-ধারণার একটা পুরো নতুন মাপকাঠি বোঝায় যাকে একটা বিশেষ পরিমণ্ডল বা সীমা বলতে পারেন। মানবতাবাদের এই বিশেষ ক্যাটিগরির সঙ্গে পূর্বের সমস্ত মানবকল্যাণের ধারণার একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। পূর্বের মানবকল্যাণের ধারণাগুলো বিশেষ যুগের বিশেষ সমাজ জীবনের প্রয়োজন থেকেই গড়ে উঠলেও তা ধর্মীয়, শাশ্বত মূল্যবোধ এবং শাশ্বত সত্যের ধারণা। অর্থাৎ বাস্তবে যে সত্য প্রতিদিন জন্ম নিচ্ছে এবং মরছে, প্রতিদিন যে নতুন নতুন

তিনের পাতায় দেখুন

পশ্চিমবঙ্গ ভাগের প্রস্তাব হীন উদ্দেশ্যে

বিজেপির পশ্চিমবঙ্গ ভাগের প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করে এসইউসিআই(সি) রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ২৬ জুলাই এক বিবৃতিতে বলেন,

যখন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, বেকার সমস্যা, ছাঁটাই, দুর্নীতি ইত্যাদি সংকটে জনজীবন জর্জরিত এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন অবশ্য প্রয়োজন, তখন হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কয়েকজন বিজেপি নেতা-মন্ত্রী সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদ উসকে দেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গকে বিভক্ত করার যে প্রস্তাব করেছেন তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং অবিলম্বে তা প্রত্যাহার করার দাবি করছি।

দেশে ১০ জন শিক্ষিত যুবকের ৮ জন বেকার এদের কী দিলেন অর্থমন্ত্রী

কেন্দ্রীয় বাজেট

রাষ্ট্রসংঘের সাম্প্রতিক রিপোর্ট বলছে, বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অপুষ্ট মানুষ থাকে ভারতে। রক্তাল্পতায় ভোগা মা, কম ওজনের সদ্যোজাত শিশু-র সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। দেশের ৪০ শতাংশ শিশুই অপুষ্টিতে ভুগছে। মানুষে মানুষে চরম আর্থিক বৈষম্য ব্রিটিশ আমলকে ছাপিয়ে গেছে। বেকারত্ব গত ৪৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। গত ১৬ জুলাই মুম্বাইয়ের

দুয়ের পাতায় দেখুন

কেন্দ্রীয় কমিটির বিবৃতি

কেন্দ্রীয় বাজেটের ওপর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৩ জুলাই এক বিবৃতিতে বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার এতদিন ধরে যে সমস্ত নীতি ও পদক্ষেপের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছে সেগুলি কতদূর পালন করা হল— তার কোনও খতিয়ান বা

পাঁচের পাতায় দেখুন

কলকাতায় বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিক্ষোভে পুলিশের বাধা

১০ হাজার স্বাক্ষর নিয়ে কলকাতায় সিইএসসি-র সদর দপ্তরে বিদ্যুৎ-গ্রাহক বিক্ষোভ। ২৪ জুলাই

বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সংগঠন অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন (অ্যাবেকার) ডাকে ২৪ জুলাই ১০ হাজার স্বাক্ষর নিয়ে কলকাতায় সিইএসসি-র সদর দপ্তরে বিক্ষোভ দেখান বিদ্যুৎ গ্রাহকরা। তারা কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানান, এফপিপিএএস-এর নামে গ্রাহকদের উপর চাপানো অতিরিক্ত সারচার্জ অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে এবং ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ আর্থিক বছরের সিইএসসি-র হিসাব ক্যাগ-কে দিয়ে পূর্ণাঙ্গ অডিট না করানো পর্যন্ত বকেয়া আদায় চলবে না। বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন অ্যাবেকার সাধারণ সম্পাদক সুব্রত বিশ্বাস সহ অন্যরা। পুলিশ বাধা দিলে গ্রাহকদের সাথে ধস্তাধস্তি হয়।

এ প্রসঙ্গে অ্যাবেকা নেতৃবৃন্দ বলেন, 'আমাদের সঙ্গে আলোচনা না করে সিইএসসি বিদ্যুতের বিল বাড়িয়ে দিল', মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্য অত্যন্ত বিস্ময়কর। এটা প্রশাসনিক ব্যর্থতা ছাড়া কিছু নয়।

অন্য দিকে বিজেপি এর বিরুদ্ধে আন্দোলনের যে ভান করছে, তা অনৈতিক এবং রাজ্যবাসীর সাথে প্রতারণা। কেন্দ্রীয় সরকারের শক্তি মন্ত্রকের বিদ্যুৎ সংশোধনী বিধি ২০২২-কে হাতিয়ার করে সিইএসসি গ্রাহকদের বিলে এফপিপিএএস নামে অতিরিক্ত সারচার্জ চাপাতে শুরু করেছে। রাজ্য বিজেপি নেতারা জনগণকে এ কথা বলছেন না। সিইএসসি এপ্রিল ২০২৩-এর বিল থেকে এই অতিরিক্ত সারচার্জের হিসাব প্রতি মাসে বিভিন্ন শতকরা হারে দেখিয়ে মুলতুবি রেখে যাচ্ছিল। এর বিরুদ্ধে এক বছরের বেশি সময় ধরে অ্যাবেকার

পাঁচের পাতায় দেখুন

বিশিষ্ট মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণ দিবসে

৫ আগস্ট

সমাবেশ

বক্তা - কমরেড প্রভাস ঘোষ ● সভাপতি - কমরেড চিররঞ্জন চক্রবর্তী ● রানি রাসমণি অ্যাভিনিউ, কলকাতা ● বেলা ২টা

SUCI (C)

কী দিলেন অর্থমন্ত্রী

একের পাতার পর

একটি সংস্থায় মাত্র ২ হাজার ২১৬টি পদের জন্য ইন্টারভিউ দিতে ২৫ হাজার কর্মহীন মানুষ উপস্থিত হলে পদপিষ্ট হওয়ার মতো অবস্থা হয়েছিল। কয়েক মাস আগে গুজরাটের ভারুচে মাত্র ১০টি শূন্য পদের জন্য ২ হাজার প্রার্থীর একে অপরকে ঠেলে ইন্টারভিউ রুমে ঢোকার মরিয়া চেষ্টায় হোটেলের রেলিং ভেঙে বিপজ্জনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। দেশে প্রতি ১০ জন শিক্ষিত যুবকের মধ্যে ৮ জনই এখন বেকার। ভয়ঙ্কর মূল্যবৃদ্ধিতে জেরবার মানুষের জীবন।

এমনই এক চূড়ান্ত দুর্দশাগ্রস্ত পরিস্থিতিতে গত ২৩ জুলাই সংসদে ২০২৪-'২৫-এর বাজেট পেশ করলেন তৃতীয় দফা বিজেপি সরকারের অর্থমন্ত্রী। মানুষ আশা করেছিল, খাদ্য, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষার মতো উন্নয়নমূলক ক্ষেত্রগুলিকে এই বাজেটে গুরুত্ব দেওয়া হবে। কৃষকদের দুর্দশা ঘোচাতে পদক্ষেপ নেবে সরকার। বাজেটে থাকবে আর্থিক বৈষম্য কমানোর দিশা। সর্বোপরি, মানুষ ভেবেছিল, এই বাজেট অবশ্যই কর্মসংস্থান সৃষ্টির রাস্তা তৈরি করবে। কিন্তু দেখা গেল, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ কোটি কোটি সাধারণ মানুষের জীবনযন্ত্রণা লাঘব করার সামান্যতম প্রচেষ্টাও এই বাজেটে অনুপস্থিত। কর্মসংস্থান সৃষ্টির নামে কিছু অস্পষ্ট ও অবাস্তব ঘোষণা আর হিসেবের গোঁজামিল ছাড়া বেকার যুবকদের জন্যেও আসলে কিছুই নেই।

খাদ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত প্রকল্পগুলিতে নির্মম বরাদ্দ ছাঁটাই

সরকারি ক্ষমতায় বসে গত দশ বছর ধরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও তাঁর দোসররা 'বিকশিত ভারত'-এর ঢাক পিটিয়ে মানুষের কানে তালা ধরিয়ে দিলেও, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবনের অসহনীয় পরিস্থিতির কথা তাঁদের খুব ভালো ভাবেই জানা আছে। সরকার জনমুখী হলে এই অবস্থায় তার উচিত ছিল উন্নয়নমূলক খাতগুলিতে অর্থ বরাদ্দ বাড়িয়ে খাদ্য, পুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদির সুযোগ যাতে দেশের জনসাধারণ ঠিক মতো পায়, সেই ব্যবস্থা করা। শিশু ও কিশোরীদের পুষ্টির জন্য সক্ষম অঙ্গনওয়াড়ি ও পোষণ-২ নামে যে প্রকল্প দুটি আছে, শিশু ও কিশোরীদের স্বাস্থ্যের উন্নতি নিয়ে ভাবনা থাকলে সরকারের অবশ্যই উচিত ছিল এই প্রকল্প দুটিতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা ও সেই অর্থের যাতে সঠিক ব্যবহার হয় তা দেখা। অথচ দেখা গেল, গত বছরের বাজেটে এই খাতে যা খরচ হয়েছিল, এ বারে বরাদ্দ তার থেকে ৩০০ কোটি টাকা কম! জনমুখী সরকারের উচিত-কাজই বটে! বিজেপি সরকার সগৌরবে প্রচার করে ভারতে নাকি 'অমৃতকাল' চলছে। এদিকে বিশ্ব ক্ষুধা সূচকের সমীক্ষায় ১২৫টি দেশের মধ্যে ভারতের জায়গা হয়েছে ১১১-তে। প্রতিদিন কয়েক কোটি মানুষ খিদের যন্ত্রণা সহ্য করে দিন গুজরান করতে বাধ্য হয়। এই পরিস্থিতিতে রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের মানুষের পাতে খাবার তুলে দেওয়া একটি সরকারের ন্যূনতম দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। অথচ এবারের বাজেটে খাদ্য ও গণবণ্টন দফতরের বরাদ্দ বিজেপি সরকার প্রায় ৮ হাজার ৯০৫ কোটি টাকা কমিয়ে দিল। শুধু তাই নয়, এবার খাদ্যে ভরতুকিও কমানো হল ৭ হাজার ৮২ কোটি টাকা! এ দিকে আর্থিক সমীক্ষা বলছে, সরকারি গুদামে মজুত শস্যের পরিমাণ দেশের মানুষের প্রয়োজনের তিনগুণ।

স্কুলে মিড ডে মিল প্রকল্প অসংখ্য অভুক্ত শিশুর পেট ভরানোর একমাত্র উপায়। এই প্রকল্পটি বাস্তবিকই গরিবি অধ্যুষিত এই দেশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রকল্প। এই প্রকল্পে বর্তমানে ছাত্রপিছু প্রাথমিকে ৫.৪৫ টাকা ও উচ্চ প্রাথমিকে ৮.১৭ টাকা বরাদ্দ রয়েছে, প্রবল মূল্যবৃদ্ধির কারণে যা দিয়ে পুষ্টিকর খাবার তো দূর, পেট ভরা ভাতটুকুও জোটানো মুশকিল। এই অবস্থায় দেশের ছাত্রছাত্রীদের প্রতি ন্যূনতম সহানুভূতি ও দায়বদ্ধতা থাকলে সরকারের উচিত ছিল মিড ডে মিল প্রকল্পে বরাদ্দ বেশ খানিকটা বাড়ানো। কিন্তু এবারের বাজেটে দেখা গেল, অত্যন্ত অমানবিক ভাবে ২০২২ সালের তুলনায় সেই বরাদ্দ ২১৩.৫ কোটি টাকা কমিয়ে দিয়েছে বিজেপি সরকার। দেশ যে সত্যিই 'অমৃতকাল'-এর মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, সন্দেহ থাকতে পারে কি?

স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ বাস্তবে কমানো হল

পরিসংখ্যান বলছে, চিকিৎসা খাতে দেশের নাগরিকদের খরচ বিপুল। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় এই খরচ ভারতে অনেক বেশি। খোদ নীতি আয়োগের সমীক্ষা বলছে, প্রতি বছর দেশের অন্তত ১০ কোটি মানুষকে চিকিৎসা করাতে গিয়ে দারিদ্র্যের কবলে পড়তে হয়। গুরুতর কোনও রোগ হলে বিপুল খরচের বোঝা কী করে সামলানো যাবে ভেবে ৪৭ শতাংশ মানুষের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। এই অবস্থায় এবারের বাজেটে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ গত বাজেটের তুলনায় টাকার অঙ্কে মাত্র ১.৭ শতাংশ বেড়েছে। মূল্যবৃদ্ধির হার কম করে ধরলেও প্রকৃত হিসাবে এই খাতে বরাদ্দ আসলে কমে গেছে কমপক্ষে ১ শতাংশ। বহুল প্রচারিত প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্য সুরক্ষা যোজনায় বরাদ্দ কমানো হয়েছে প্রায় ১ হাজার কোটি টাকা। নতুন 'এইমস' হাসপাতাল তৈরি, সংক্রামক রোগ প্রতিরোধে উন্নত চিকিৎসা পরিকাঠামো গড়ে তোলা, জাতীয় ডিজিটাল স্বাস্থ্য মিশন, জরুরিকালীন চিকিৎসা সহ নানা বিষয়ে পরিকাঠামো বাবদ বরাদ্দ কমানো হয়েছে। শুধু তিনটি ক্যানসারের ওষুধের শুল্ক মকুব করেই দায় সেরেছেন অর্থমন্ত্রী। গত বছরের বাজেটে জরায়ুমুখ ক্যান্সার ও সিকল সেল অ্যানিমিয়া দূর করতে বিরাট প্রকল্প ঘোষণা করেছিলেন তিনি। তার কাজ এখনও শুরুই হয়নি। এবারের বাজেটে কিন্তু সে কথা ভুলেও একটিবার উল্লেখ করলেন না অর্থমন্ত্রী।

শিক্ষা খাতের হালও তথৈবচ

একটি দেশের উন্নয়ন অনেকাংশেই নির্ভর করে সেখানকার জনসাধারণের শিক্ষার মানের উপর। শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞরা দীর্ঘদিন ধরে মোট জাতীয় আয়ের একটা বড় অংশ শিক্ষা খাতে ব্যয় করার দাবি করে আসছেন। এবারের বাজেটে শিক্ষা খাতে যদিও বরাদ্দ সামান্য বাড়ানো হলেও মূল্যবৃদ্ধির নিরিখে বিচার করলে প্রকৃত বরাদ্দ বাস্তবে কমানো হয়েছে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই ক্ষেত্রটিতে বরাদ্দ করা হয়েছে মোট বাজেট ব্যয়ের মাত্র ২.৬ শতাংশ। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষায় ব্যয়বরাদ্দ বাড়েনি। মাদ্রাসা শিক্ষা ও সংখ্যালঘুদের শিক্ষা প্রকল্পের বরাদ্দ গত বছরের ১০ কোটি টাকা থেকে কমিয়ে ২ কোটি টাকা করেছে বিজেপি সরকার। বরাদ্দ না বাড়ালেও ছাত্রদের জন্য অর্থমন্ত্রী অবশ্য বেশ কিছু ঋণের বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন। অর্থাৎ যুগ যুগ ধরে ধারাবাহিক সংগ্রামের ফলশ্রুতিতে যে বিপুল জ্ঞান মানবসমাজে অর্জিত হয়েছে, শিক্ষার অবাধ বিস্তারের মধ্য দিয়ে দেশের ছাত্রসমাজকে তার সংস্পর্শে আসার সুযোগ দেওয়ার বদলে বিজেপি সরকার তাদের ঋণের জালে জড়িয়ে ফেলতে চাইছে। শুধু তাই নয়, মৌলিক শিক্ষায় বরাদ্দ না বাড়িয়ে বিজেপি সরকার বরাদ্দ বাড়িয়েছে আইটিআইগুলির উন্নতিকল্পে, যাতে সার্বিক জ্ঞান অর্জনের বদলে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন কিছু প্রযুক্তিবিদ তৈরি করা যায়। যাতে সমাজে মূল্যবোধসম্পন্ন প্রকৃত মানুষ তৈরির প্রক্রিয়াতেই ভাটা পড়ে।

বাজেটে উপেক্ষিত কৃষি ও কৃষক সমাজ

কৃষিকে বলা হয় ভারতের অর্থনীতির ভিত্তি। এ দেশের অর্থনীতি আজও বহুলাংশেই কৃষিনির্ভর। এ দেশের কৃষকসমাজ বহু দিক থেকেই বঞ্চিত, উপেক্ষিত। বহুজাতিক কোম্পানিগুলির মুনাফা লুটের বলি হয়ে সার, বীজ, কীটনাশকের বিপুল খরচ মেটাতে তারা ক্রমাগত ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ছে। প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও খ্যাতনামা কৃষিবিজ্ঞানী স্বামীনাথনের ফর্মুলা মেনে ফসলের উৎপাদন খরচের দেড়গুণ ন্যূনতম সহায়ক মূল্য আজও তাদের জোটেনি। ফসল ওঠার পর সরকারি সংগ্রহ ব্যবস্থার অপদার্থতা ও উদাসীনতার কারণে আজও দেশের কৃষকদের একটা বড় অংশ ফড়ে, মজুতদারের কাছে অল্প দামে ফসল বেচে দিতে বাধ্য হয়। দেশ জুড়ে অতিপ্রয়োজনীয় সেচ ব্যবস্থার ভয়ঙ্কর অভাব। দিল্লি সীমান্তে দীর্ঘ এক বছর ধরে ৭৫০ প্রাণ বলি দিয়ে কৃষকরা আন্দোলন চালিয়েছেন। তা সত্ত্বেও এ বারের বাজেটে কৃষি ও কৃষকের উন্নতির লক্ষ্যে কোনও পদক্ষেপই নিতে দেখা গেল না সরকারকে। গত বছরে কৃষি ও কৃষক উন্নয়ন মন্ত্রক যে ব্যয় করেছিল, এবারে ব্যয়বরাদ্দ তার থেকে সামান্য বেশি হলেও মূল্যবৃদ্ধি হিসাব করলে কার্যত তাকে কোনও বৃদ্ধিই বলা যায় না। শুধু তাই নয়, সরকার এবার সার দফতরের বাজেট বরাদ্দ কমিয়ে দিয়েছে। সেচে ভরতুকি কমানো হয়েছে ২৪ হাজার ৮৯৪ কোটি টাকা। এমনকি সারেও ভরতুকির পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছে বিজেপি সরকার। দেশ জুড়ে কৃষকদের দাবির প্রতি কর্ণপাত না করে এবারের বাজেটেও ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের কথা উল্লেখ করেননি অর্থমন্ত্রী।

কর্মসংস্থানের নামে ধোলাটে ও অবাস্তব পরিকল্পনা

দেশের কর্মপ্রার্থী যুবসমাজের সঙ্গেই বোধহয় সবচেয়ে বড় প্রতারণাটি করা হয়েছে এবারের বাজেটে। এ বারের লোকসভা ভোটে বিজেপির একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ার পিছনে বেকারি-গরিবি-মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভের প্রতিফলন ঘটেছে বুঝে বাজেট ভাষণে বেশ কয়েকবার 'কর্মসংস্থান' শব্দটি উচ্চারণ করেছেন অর্থমন্ত্রী, যা আগের বছরের বাজেট ভাষণগুলিতে তাঁর মুখে শোনা যায়নি। কিন্তু ওটুকুই সার। বাস্তবে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি সম্পর্কে যে পরিকল্পনাগুলি পেশ করেছেন তিনি, তা যেমন অস্পষ্ট, তার হিসেব তেমনই গোঁজামিলে ভরা।

বাজেটে আগামী পাঁচ বছরে ৪ কোটি ১০ লক্ষ কর্মসংস্থানের বিরাট ঘোষণা করা হয়েছে। কী ভাবে তা হবে, অঙ্ক কষে তার হিসাবও দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী, যদিও সে হিসাব গরমিলে ভরা এবং তার সঙ্গে বাস্তবের কোনও সম্পর্কই নেই। বিপুল সংখ্যক চাকরির এই ঘোষণা যত অস্পষ্টই হোক, এর মধ্যে দিয়ে মালিকদের পাইয়ে দেওয়ার মতলবটি কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যায়। আরও বোঝা যায়, কর্মসংস্থান

ছয়ের পাতায় দেখুন

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (সি) কলকাতা জেলার বড়িশা লোকাল কমিটির প্রবীণ কর্মী কমরেড সমীর সিকদার ১ মে ৮৩ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

পারিবারিক সূত্রে অল্প বয়সেই তিনি দলের সান্নিধ্যে আসেন। ফিলিপস কোম্পানিতে চাকরিরত অবস্থাতেই তিনি বড়িশার অন্তর্গত ফিলিপস কোয়ার্টারে চলে আসেন এবং সাংগঠনিকভাবে সরশুনা লোকালের সাথে যুক্ত হয়ে দলের কাজ শুরু করেন। সেই সময় প্রায় প্রতিদিন তিনি অফিস থেকে সোজা বকুলতলার পার্টি অফিসে চলে আসতেন এবং রাত পর্যন্ত পার্টির কাজে থাকতেন।

তিনি বেশ কিছুদিন 'অ্যান্টি-ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরাম' অফিসের দায়িত্ব যত্নের সাথে পালন করেন। এই সময় তিনি দলের আরও ঘনিষ্ঠ হন এবং সদস্য পদ লাভ করেন।

২১ জুলাই তাঁর স্মরণসভা হয় স্থানীয় চণ্ডীমাতা ভিলায়। স্মৃতিচারণা করেন বড়িশা লোকালের কয়েকজন সদস্য সহ দলের জেলা নেতৃত্ব। মূল বক্তা ছিলেন জেলা সম্পাদক কমরেড সুব্রত গৌড়ী। বক্তাদের বক্তব্য থেকে তাঁর জীবনের গুণাবলির কথা উঠে আসে। নিজের দুই সন্তানকে দলের সাথে যুক্ত করেন তিনি। প্রবল আর্থিক অনটন সত্ত্বেও তাঁর ছোট ছেলে জীবিকা ছেড়ে দলের সর্বক্ষণের কর্মীতে পরিণত হন। এটা তিনি খুশিমনে মেনে নিয়েছিলেন। পক্ষাঘাতে সারা শরীর অচল হয়ে যাওয়ার পরেও দলের খোঁজখবর রাখার চেষ্টা করতেন। দলের যে কোনও সাফল্যে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠত। তাঁর বাড়ির দরজা কমরেডদের জন্য সব সময় ছিল অবারিত। যাঁরা এই মানুষটিকে কাছ থেকে দেখেছেন তাঁরা সকলেই তাঁর মৃত্যুতে ব্যথিত। তাঁর চরিত্রের গুণাবলি থেকে শিক্ষা গ্রহণের আহ্বান দিয়ে স্মরণসভা শেষ হয়।

কমরেড সমীর শিকদার লাল সেলাম

কৃষককে বাঁচাতে হলে কেন্দ্রীয় সরকারকে দুটি কাজ করতে হবে

এ দেশের কৃষক-খেতমজুর জীবনের অপরিসীম দুঃখ-দুর্দশার কথা কারও অজানা নয়। প্রতি ১২ মিনিটে একজন কৃষক এ দেশে আত্মহত্যা করেন। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে দারিদ্রের দুঃসহ জ্বালা সহ্য করে তাঁদের দিনাতিপাত করতে হয়। এ দিকে কোনও সরকারেরই কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। তাঁরা ব্যস্ত দেশি-বিদেশি একচেটিয়া পুঁজির সেবা করতে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই এই সব একচেটিয়া পুঁজির সম্পদ প্রতিদিন ফুলে ফেঁপে উঠছে, আর জনগণ নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, দেশের ১ শতাংশ মানুষের হাতে দেশের মোট সম্পদের ৪০ শতাংশ গিয়ে জড়ো হয়েছে। এই হল দেশের বাস্তব পরিস্থিতি।

এই কর্পোরেট পুঁজিপতিদের সম্পদ স্ফীতিকেই উন্নয়ন বলে দাবি করছেন একদল ধামাধরা বুদ্ধিজীবী। তাঁরা নানা কুযুক্তি তুলে শোষণের এই মহোৎসবকে ন্যায়সঙ্গত প্রতিপন্ন করতে চাইছেন। এই কাজ করতে গিয়ে তাঁরা অনেক সময় গরিব মানুষের প্রতি একধরনের ছদ্ম সহানুভূতি দেখান, দু-একটা সরকার বিরোধী কথাও বলেন, রাষ্ট্রকে একটু উপদেশও দেন। কিন্তু মূল জায়গায় আঁকড়ে থাকতে তাঁদের ভুল হয় না। রাষ্ট্রীয় যে নীতির ফলে গরিব মানুষের জীবনে এই দুর্দশা, পুঁজিপতিদের এই সম্পদ স্ফীতি তা যেন বহাল তবিয়তে বজায় থাকে সে দিকে তাঁদের প্রখর দৃষ্টি। এই ধরনের একটা সম্পাদকীয় নিবন্ধ গত ১৮ জুলাই আনন্দবাজার পত্রিকায় 'ধামাচাপার চেষ্টা' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। এই নিবন্ধেও লেখক অত্যন্ত মুন্সিয়ানার সাথে একই কাজ করেছেন। কেন্দ্রীয় কৃষিনীতির বিরুদ্ধে শুরুতে একটু বিরোধিতার ভাব প্রকাশ করে মাঝামাঝি জায়গায় এসে ঝুলি থেকে বেড়াল বের করে দিয়েছেন।

প্রবন্ধে লেখা হয়েছে— চাষিরা যে পর্যায়ে সরকারি সুরক্ষা চাইছেন এবং কৃষিকে বেসরকারি বিনিয়োগ থেকে দূরে রাখতে চাইছেন, তাতে চাষ কার্যত একটা রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াবে। অর্থাৎ মোদ্দা কথা হল, যেহেতু চাষকে কার্যত একটা রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে পরিণত করা যায় না, তাই চাষি যে সব সুযোগ সুবিধা চাইছে তা তাকে দেওয়া সম্ভব নয় এবং বেসরকারি বিনিয়োগ থেকে কৃষিকে মুক্ত করার দাবিও অযৌক্তিক। সম্পাদকীয় নিবন্ধের এই যুক্তিকে আমাদের বিচার করে দেখতে হবে। কিন্তু তার আগে দেখা দরকার আমাদের দেশে কৃষি এতদিন কোন নিয়মে পরিচালিত হয়েছে, এতদিন কাদের স্বার্থ রক্ষা করেছে।

স্বাধীনতার পর থেকেই এ দেশের কৃষি বিকশিত হয়েছে পুঁজিবাদী পথে। এই পথ বেয়ে, বিশেষ করে তথাকথিত সবুজ বিপ্লবের পর থেকে ধীরে ধীরে কৃষি উৎপাদন সামগ্রী, জমি ও কৃষি বিপণন এক এক করে একচেটিয়া পুঁজির করতলগত হতে থাকে। দেখা যায়, সমস্ত কৃষি উপকরণ ও কৃষিজ পণ্য চলে গিয়েছে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের হাতে। সমস্ত সরকারি নীতি ও পরিকল্পনা এই লক্ষ্যেই পরিচালিত হচ্ছে। ফলে গ্রামাঞ্চলে কৃষক ক্রমাগত জমি হারিয়ে খেতমজুরে পরিণত হচ্ছে। আর খেতমজুর পরিণত হচ্ছে ভিখারিতে। নয়া আর্থিক নীতি গ্রহণের পর এই প্রক্রিয়া আরও বেগবান হয়েছে। অর্থাৎ বলা যায়, স্বাধীনতার পর সমস্ত সময় জুড়েই কৃষকদের এই সর্বনাশ করা হয়েছে। আর এই সময়ে ক্ষমতায় ছিল প্রধানত কংগ্রেস।

২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর বিজেপি কি কোনও ভিন্ন পথ গ্রহণ করেছে? না। তারা এই প্রক্রিয়া আরও বেগবান করেছে, একচেটিয়া পুঁজির সেবা করার কাজে এরা আগের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। এরা কী কী নীতি গ্রহণ করেছে সে দিকে একটু দৃষ্টি দেওয়া যাক।

১। সমস্ত কৃষি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সার, বীজ, বিদ্যুৎ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি উপকরণের বেসরকারিকরণ করা। বিজেপি এই বিষয়টাকে চরম সীমায় নিয়ে গিয়েছে। সার, বীজ, কীটনাশক, জল, বিদ্যুৎ প্রভৃতির উপর বৃহৎ বহুজাতিক পুঁজির কর্তৃত্ব এখন প্রশ্নাতীত। ফলে এই সব কৃষিপণ্য উৎপাদন সামগ্রীর দাম হয়েছে আকাশছোঁয়া। ফলে চাষের খরচ বাড়ছে। চাষে নগদ টাকার প্রয়োজন বাড়ছে। বিদ্যুৎ-ক্ষেত্রকে বহুজাতিক পুঁজির হাতে পুরোপুরি তুলে দেওয়ার জন্য বিজেপি সরকার বিদ্যুৎ বিল ২০২৩ প্রণয়ন করেছে।

২। নগদ টাকার ব্যবস্থা সরকার করছে না। বিজেপি সরকারের কৃষিঋণ-নীতির ফলে ক্ষুদ্র মাঝারি প্রান্তিক কৃষকদের ব্যাঙ্কঋণ পাওয়ার উপায় নেই। ফলে তাঁদের গ্রামের মহাজনদের দ্বারস্থ হতে হয়, অনেক বেশি সুদে টাকা ধার করতে হয়। ফলে ঋণের বোঝা বাড়ে, কৃষক আত্মহত্যা বৃদ্ধি পায়।

৩। লাভজনক দামে ফসল বিক্রির ব্যবস্থা নেই। বিজেপি সরকার মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইসকে আইনসিদ্ধ করতে চাইছে না। ঘোষণা করেছিল ২৩টি কৃষিজ দ্রব্য এমএসপি রেটে কিনবে। কিন্তু বাস্তবে কিছুটা কিনছে চাল আর গম এবং তার পরিমাণ ক্রমাগত কমছে। যতটুকু কিনছে তা কিনছে মূলত পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ থেকে। দেশের মাত্র ৬ শতাংশ কৃষক এর সুযোগ পায়।

বিজেপি সরকার এই ব্যবস্থাও বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করছে। বেসরকারি মান্ডি খুলে শস্য সংগ্রহের অধিকার বৃহৎ পুঁজিকে দিয়ে দেওয়ার ফলে শস্যবাজার নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এই বৃহৎ পুঁজির ভূমিকা এখন নিয়ন্ত্রণকারী।

৪। খুচরো ব্যবসায় দেশি-বিদেশি বৃহৎ পুঁজির প্রবেশের অবাধ অধিকার দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কৃত্রিম ভাবে দাম কমিয়ে ছোট ব্যবসা এবং কৃষককে বাজার থেকে হটিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা এদের অসীম। আগে কৃষকরা ছোটখাটো ফড়েদের সাথে খানিকটা লড়তে পারত। কিন্তু বৃহৎ পুঁজির সামনে কৃষকরা এখন অসহায়।

এ বছর হিমাচলপ্রদেশে কৃষকরা আদানি কোম্পানির কাছে আপেল ১৮ টাকা কেজি দরে বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে। সেই আপেল আদানি রিটেল চেন দিল্লিতে বিক্রি করেছে ২৬৯ টাকা কেজি দরে। মনে রাখতে হবে, এই

ছয়ের পাতায় দেখুন

সমাজের প্রয়োজনকে কেন্দ্র করে আদর্শবাদের ধারণা পাল্টায়

একের পাতার পর

সত্যের জন্ম হচ্ছে, তাকে অস্বীকার করে একটা সত্য যা একটা সময়ে গড়ে উঠল, তাকেই শাশ্বত সত্য রূপে ধরে সবসময়ে সমস্ত অবস্থাতেই সমস্ত বিশেষ সত্যের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। ধর্মীয় মূল্যবোধ বলতে এ রকমই শাশ্বত মূল্যবোধের ধারণা বোঝায়।

বাস্তবে, সমাজের প্রয়োজনে, মানুষের প্রয়োজনে, অর্থাৎ চলমান গতির মধ্য থেকে যে প্রয়োজন প্রতিভাত হয়, তাকে কেন্দ্র করেই মূল্যবোধগুলো গড়ে ওঠে। এর আসার ইতিহাস আছে, এর যাওয়ার ইতিহাস আছে। এ বিশেষ সত্য, সর্বসময়ে বিশেষ রূপে প্রতিভাত। এক একটা পরিমণ্ডলের মধ্যে সব বিশেষগুলোকে সমন্বয়ের মাধ্যমে যে একটা সাধারণ সত্যের ধারণা হয়, যা সমস্ত সমাজ জীবনকে, সমস্ত 'ওয়াকস অফ লাইফ'কে গাইড করে, সেই সাধারণ সত্যের ধারণাও কিন্তু ওই বিশেষ পরিমণ্ডলের সীমার দ্বারা সীমায়িত। আপনাদের মনে রাখা প্রয়োজন, সমাজের মধ্যে প্রচলিত একটা আদর্শবাদ, ন্যায়নীতির একটা কাঠামো— অর্থাৎ ভালমন্দ, উচিত-অনুচিত সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণাগুলো একটা বিশেষ সমাজের বিশেষ অগ্রগতির প্রয়োজন থেকে উদ্ভূত একটা বিশেষ ধারণা। সেই সময়টা অতিক্রান্ত হলে, সেই প্রয়োজনটা পার করে দিলে সম্পূর্ণ নতুন একটা সমাজব্যবস্থার পরিবেশের সামনে নতুন উৎপাদিকা শক্তি এবং নতুন দ্বন্দ্ব ও সমস্যার ভিত্তিতে যখন নতুন প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন সমাজে নতুন আদর্শবাদেরও প্রয়োজন দেখা দেয়। সেই সময় পুরনো আদর্শবাদ, পুরনো ভালমন্দের যে বিশেষ ধারণা একদিন সমাজ প্রগতিতে সাহায্য করেছে, সমাজকে এগিয়ে দিয়েছে, সমাজের সংহতি ও ঐক্যকে রক্ষা করেছে এবং অন্যায় থেকে মানুষকে বাঁচিয়েছে, তাকেই কেউ ধরে থাকলে সে খোদ নিজেই অন্যায় করতে থাকবে। সে বুঝতে পারবে না, কী করে সে অন্যায় করছে, শুধু র‍্যাশানালাইজ করবে অবস্থার দোহাই দিয়ে।

আর মনে রাখবেন, এই ন্যায়-অন্যায়ের ধারণা ক্রমাগত পাল্টাচ্ছে। কিন্তু ন্যায়-অন্যায় সবসময় আছে। তাই নৈতিকতাও সবসময় আছে। এক ধরনের কিছু লোক আছেন যাঁরা মনে করেন, আধুনিক জীবনযাত্রা, বিজ্ঞান ও বস্তুতান্ত্রিক চিন্তা অনুযায়ী ন্যায়নীতি, মূল্যবোধ, নৈতিকতা— এগুলি হচ্ছে সব বুর্জোয়া কুসংস্কার বা সামন্ততান্ত্রিক ধর্মীয় কুসংস্কার। এই সমস্ত লোকেরা বিজ্ঞানের দোহাই দেন, মার্ক্সবাদের কথা বলেন। আমি নিজে মার্ক্সবাদী হয়েও কোনও দিন তাদের সঙ্গে একমত ছিলাম না, আজও নই। আর এক দল 'প্রায়রি ভ্যালু' অর্থাৎ পূর্বস্থিরীকৃত সত্ত্বার অস্তিত্ব থেকে উদ্ভূত যে মূল্যবোধগুলোকে দর্শনে প্রায়রি ভ্যালু বলা হয়, সেই মূল্যবোধের মধ্যে ন্যায়নীতি, ভালমন্দ, আদর্শবাদের যে শাশ্বত ও স্থবির কতকগুলো ধারণা আছে, সেইগুলোকেই 'মর‍্যালিটি' মনে করেন। সমস্ত সমাজের যথার্থ ও সত্যিকারের প্রয়োজনকে কেন্দ্র করে মর‍্যালিটি বা আদর্শবাদের ধারণা ক্রমাগত পাল্টায়। কিন্তু মর‍্যালিটি ও ন্যায়-অন্যায়ের ধারণা সবসময়ই আছে এবং থাকবে, কেবল তার কনটেন্ট ও ফর্ম পাল্টাবে। তাই, মূল্যবোধের ধারণার একটা বিশেষ ক্যাটিগরি, যেটা এই সীমাকে অতিক্রম করতে গেলেই বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করে এবং তার ফলে মানুষের কল্যাণসাধনের সদিচ্ছা সত্ত্বেও আসলে অকল্যাণই সাধন করে বলে নতুন মূল্যবোধের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তা না হলে শিল্পবিপ্লবকে কেন্দ্র করে সেকুলার মানবতাবাদের জন্ম হত না। এই সেকুলার মানবতাবাদ ইউরোপে গোড়ায় ছিল ধর্মের সাথে আপসহীন, ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে তা আপস করেনি। ধর্মের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল— ওটা ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ব্যাপার। 'সেকুলার' রাষ্ট্রে ধর্মে বিশ্বাসী এবং যে ধর্মে বিশ্বাস করে না উভয়েরই একই অধিকার থাকবে। কিন্তু, রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি, ন্যায়নীতি, বিজ্ঞানসাধনা এগুলোর ওপর ধর্ম চাপাতে গেলে তা বাধার সৃষ্টি করে। ফলে, এগুলোকে ধর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে হবে। ফলে সেকুলার মানবতাবাদের ভিত্তিতে যে গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে তা ধর্মকে বাধা দেবে না, প্রশ্রয়ও দেবে না। ব্যক্তিগতভাবে যদি কেউ ধর্মে বিশ্বাস করে, সে ধর্মীয় আচরণ করতে পারে। কিন্তু, ধর্ম বিশ্বাস করানোর জন্য কাউকে জোর করা চলবে না। প্রথমে মানবতাবাদী আন্দোলনটা ইউরোপে গড়ে উঠেছিল এই ধারণার ভিত্তিতেই। তাদের জাতীয় চরিত্রের মানসিকতা, বলিষ্ঠতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের গুণাবলিগুলো, নারী স্বাধীনতা সম্বন্ধে ধারণাগুলো, মূল্যবোধের ধারণাগুলো গড়ে উঠেছিল প্রবল সেকুলার আন্দোলনের ভিত্তিতেই। সেকুলার মানবতাবাদের এই ধারণাটা কিন্তু ইউরোপের বুর্জোয়ারা সমাজজীবনে, রাষ্ট্রনীতিতে বেশিদূর পর্যন্ত রক্ষা করতে পারল না। কিছুদূর এগোবার পরই পুঁজিবাদের প্রতিক্রিয়াশীল স্তরে তারা ধীরে ধীরে 'ক্রিশ্চিয়ানিটি'র মূল সুরের সঙ্গে এই সেকুলার হিউম্যানিজমের একটা আপস করল। যদিও এ কথা তারা আজও বলে না এবং সে জন্য তাদের সংবিধানে এখনও তার প্রতিফলন রয়েছে। তাদের সংবিধানে এখনও রয়েছে যে, ধর্মে বিশ্বাসী এবং যে ধর্মে বিশ্বাস করে না, রাষ্ট্রে উভয়েরই সমান অধিকার থাকবে।"

(শরৎচন্দ্রের চিন্তা ও সাহিত্য রচনা থেকে)

বাজেটে স্কিমওয়ার্কারদের প্রতি প্রতারণা

দেশে প্রায় দু'কোটি মহিলা শ্রমিক কেন্দ্রের নানা গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা ক্ষেত্রে কাজ করেন। তার মধ্যে বেশ কিছু সরকারি পরিষেবা ক্ষেত্রে সরকারি কর্মীর মতো কাজ করেন আশা, অঙ্গনওয়াড়ি, পৌর স্বাস্থ্যকর্মী ও মিড-ডে মিল কর্মীরা। কেন্দ্রীয়

সরকার বহু প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও বাজেটে এই সমস্ত কর্মীদের জন্য কোনও বরাদ্দ বৃদ্ধি তো করেইনি, বরং প্রকল্পগুলিতে বরাদ্দ বিগত বছরের থেকে আরও কমিয়ে দিয়েছে। সরকার এমনিতেই এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবাগুলির বেসরকারিকরণ করে প্রকল্পের নামে কর্মীদের ছিটেফোঁটা কিছু ধরিয়ে দিয়ে চূড়ান্ত ভাবে বঞ্চিত করছে, ন্যায্য পাওনা দিচ্ছে না। আন্দোলনের চাপে নানা সময় প্রতিশ্রুতি দিলেও বাজেটে তা পূরণের কোনও চিহ্ন নেই। স্কিম ওয়ার্কার্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া এই বাজেটের প্রতিবাদ জানিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের ইসমত আরা খাতুন ও কৃষ্ণা প্রধান, ওয়েস্ট বেঙ্গল অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড হেল্পার্স ইউনিয়নের মাধবী পণ্ডিত, সারা বাংলা মিড ডে মিল ইউনিয়নের সুনন্দা পণ্ডা, পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্যকর্মী ইউনিয়নের কেকা পাল, পৌলমী করঞ্জাই এক যৌথ বিবৃতিতে বলেন, তাদের সরকারি কর্মীর মতোই সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে ও এই খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে।

পুরুলিয়া পৌরসভায় বিক্ষোভ

পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত, রাস্তাঘাটের সংস্কার, নালা-নর্দমা নিয়মিত পরিষ্কার, শহরে পুকুর জলাশয় ভরাট বন্ধ করে সমস্ত পুকুর সংস্কার সহ ১০ দফা দাবিতে

২৩ জুলাই পৌরসভায় বিক্ষোভ দেখায় এসইউসিআই(সি) পুরুলিয়া শহর কমিটি। দলের কর্মী সমর্থকরা মানভূম মোড়ে পথসভার পর মিছিল সহ পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যানকে ডেপুটেশন দেন। পরে লোকাল সম্পাদক সুব্রত মুখার্জীর নেতৃত্বে পাঁচ জনের প্রতিনিধিদল দাবি সনদ পেশ করেন। তিনি দাবিগুলো পূরণের আশ্বাস দেন।

এসইউসিআই(সি)-র কেন্দ্রীয় ওয়েবসাইট
https://sucic.org

শিবদাস ঘোষের চিন্তা জানতে আগ্রহী সাধারণ মানুষ

৫ আগস্ট মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষের ৪৮তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে রাজ্য জুড়ে অসংখ্য স্থানে তাঁর চিন্তাসংবলিত উদ্ধৃতি প্রদর্শনী, বইয়ের স্টল, গ্রুপ বৈঠক, পথসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ছবি ঃ জাকারিয়া স্ট্রিটে বুকস্টল, কলকাতা

মদ বিরোধী নাগরিক কনভেনশন মগরাহাটে

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় মগরাহাটের মোহনপুর অঞ্চলের শালিকা গ্রামে বার কাম মদের দোকান খোলার বিরুদ্ধে নাগরিকরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। গ্রামবাসীদের আশঙ্কা, মদের দোকান হলে অসামাজিক লোকজনের আনাগোনা বাড়বে, ঘরে ঘরে অশান্তি বাড়বে। নেশাগ্রস্ত মানুষের যান-চালনার ফলে দুর্ঘটনার সংখ্যা বাড়বে। এলাকার বেকার যুবকরা ব্যাপক হারে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়বে। এলাকার মহিলা ও ছাত্রছাত্রীরা কমিটি তৈরি করে আন্দোলন করছেন। বিক্ষোভ, রাস্তা অবরোধ এবং বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তরে গণস্বাক্ষরিত দাবিপত্র দেওয়া হয়।

আন্দোলনের চাপে দোকান খোলার প্রক্রিয়া সাময়িক থমকালেও প্রতিক্রিয়াশীল নানা গোষ্ঠী, সমাজবিরোধীদের মদতে পুনরায় দোকানটি চালু করার চেষ্টা চলছে। ফলে আট-দশটি গ্রামের সাধারণ মানুষ প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফুঁসছে। ২২ জুলাই রামনাথপুর মোড়ে এক নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রায় আটশো জন মানুষ উপস্থিত ছিলেন। মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। সভাপতিত্ব করেন মন্টু মণ্ডল। বহু বিশিষ্ট মানুষ বক্তব্য রাখেন। কনভেনশন থেকে ধামুয়া দক্ষিণ-আমড়াতলা-মোহনপুর নাগরিক কমিটি গঠিত হয়। কমিটির নেতৃত্বে আগামী দিনে মদ সহ স্থানীয় বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে সভাপতি ঘোষণা করেন।

একচেটিয়া মালিকদের স্বার্থেই কেন্দ্রীয় বাজেট

এ আই ইউ টি ইউ সি

কেন্দ্রীয় বাজেটকে শ্রমিকবিরোধী, জনবিরোধী ও একচেটিয়া পুঁজিমালিকদের স্বার্থবাহী হিসাবে নিন্দা করে এ আই ইউ টি ইউ সি-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্ত ২৪ জুলাই এক বিবৃতিতে বলেন, প্রাক বাজেট বৈঠকে এ আই ইউ টি ইউ সি সহ সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন একযোগে যে বক্তব্য ও মতামত রেখেছিল বাজেটে তা পুরোপুরি অগ্রাহ্য করা হয়েছে।

বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের পুঁজিপতি শ্রেণির তোষণকারী চরিত্র এই বাজেটে আবার ফুটে উঠল। মুষ্টিমেয় অতি ধনী এবং দরিদ্র জনগণ বিশেষত খেটে খাওয়া মানুষের মধ্যেকার বৈষম্য আরও বাড়বে। সমস্ত জিনিসপত্র বিশেষত খাদ্যের ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধির ফলে খেটে-খাওয়া মানুষের বিপদগ্রস্ত অবস্থার কোনও উল্লেখই এই বাজেটে নেই। একই ভাবে নেই যুব সমাজের ওপর তীব্র আঘাত নামিয়ে আনা বেকারত্ব, প্রকৃত মজুরির হারের ভয়াবহ ক্ষয় এবং অন্যান্য যে সমস্যাগুলিতে জনজীবন বিপর্যস্ত হচ্ছে তার কথা। সব ধরনের শ্রমিকের জন্য সামাজিক সুরক্ষার গ্যারান্টি নিয়ে এই বাজেট নীরব। শ্রমিক কর্মচারীদের ন্যায্য দাবি মেনে নতুন পেনশন স্কিম বাতিল করে পুরনো পেনশন স্কিম ফিরিয়ে আনার উল্লেখও বাজেটে নেই। স্কিম ওয়ার্কার সহ সমস্ত অসংগঠিত ক্ষেত্রের বিপুল সংখ্যক কর্মীদের স্বস্তি দিতে কিছুই বলা হয়নি। গ্রামীণ কর্মসংস্থান (এমএনরেগা), জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন, মিড ডে মিল, আশা, আইসিডিএস-এর মতো স্কিমগুলিতে এক টাকাও বরাদ্দ বাড়েনি।

ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের দাবি মেনে গরিব কৃষকদের জন্য এমএসপি-র আইনি গ্যারান্টিও দেওয়া হয়নি। একইভাবে জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা সহ জনজীবনের গুরুত্বপূর্ণ বহু বিষয়ও উপেক্ষিত হয়েছে। এক কথায় কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের এই বাজেটে শ্রমজীবী মানুষ ও জনসাধারণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে এ আই ইউ টি ইউ সি দেশের খেটেখাওয়া মানুষের কাছে কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিক বিরোধী, জনবিরোধী, একচেটিয়া পুঁজিমালিকদের তোষণের নীতির বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার আবেদন জানাচ্ছে।

মোবাইল মাশুল বৃদ্ধি ও স্মার্ট মিটারের প্রতিবাদ নদীয়ায়

মোবাইল মাশুল ১৪-২৫ শতাংশ বৃদ্ধি, নিট ও নেট পরীক্ষার দুর্নীতিতে জড়িতদের শাস্তির দাবিতে এবং বিদ্যুতে স্মার্ট মিটার বসানোর প্রতিবাদে ৯ জুলাই কল্যাণী মেন স্টেশনের রেলগেটের কাছে এস ইউ সি আই(কমিউনিস্ট) বিক্ষোভ দেখায়। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক রথীন বিশ্বাস এবং সংগঠক পিন্টু সাহা প্রমুখ। মাশুল বৃদ্ধির প্রতিলিপিতে অগ্নিসংযোগ করেন জেলা কমিটির সদস্য অঞ্জন মুখার্জী। একই দাবিতে চাপড়াতেও বিক্ষোভ কর্মসূচি হয়। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন লোকাল সম্পাদক মধুমিতা কুণ্ডু, আইনজীবী মোজাম্মেল হোসেন মণ্ডল প্রমুখ।

খুনে অভিযুক্তদের শাস্তির দাবি

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় দলের গোসাবা লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে ২৫ জুলাই গোসাবা থানায় ডেপুটেশন দেওয়া হয়। গোসাবার কচুখালি ও লাহিড়ীপুরে ছেলেধরা সন্দেহে গণপিটুনির ঘটনায় দু'জন নিরপরাধ মহিলাকে বীভৎস মারধরে যুক্ত দোষীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তি এবং রাঙাবেলিয়ার বাগবাগানে দু'বছরের মধ্যে একই পরিবারের ৪ জনকে হত্যা করে 'স্বাভাবিক মৃত্যু' বলে চালিয়ে দেওয়ার ঘটনায় অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার ও কঠোর সাজার দাবিতে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। থানার ওসি এই দুটি ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন এবং গণপিটুনির সাথে যুক্ত ২ জনকে ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, বাকিদের ধরার চেষ্টা চলছে বলে জানান। ছিলেন কমরেডস চন্দন মাইতি, বিকাশ শাসমল, তপন মিস্ত্রি ও জয়ন্তী গিরি।

ছাত্রী খুনে থানায় বিক্ষোভ

ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রীকে নির্যাতন ও খুনের ঘটনার প্রতিবাদে ১৯ জুলাই জয়পুরে বিক্ষোভ মিছিল করে এস ইউ সি আই (সি) হাওড়া গ্রামীণ জেলা কমিটি। অপরাধীদের সকলকে গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে জয়পুর থানায় ডেপুটেশন দেয়। বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদিকা মিনতি সরকার, সরোজ মাইতি ও মোহাম্মদ মাসুদ প্রমুখ। ১০ জুলাই রাতে নিখোঁজ হয় ওই ছাত্রী। চাষের জমি থেকে তার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। দাবি করা হয়, সব অপরাধীকে গ্রেফতার করে শাস্তি দিতে হবে, অবিলম্বে মদ নিষিদ্ধ করতে হবে, সিনেমা, পত্র-পত্রিকায় নারীদেহ নিয়ে অশ্লীল বিজ্ঞাপন বন্ধ করতে হবে।

শহিদ স্মরণে হাইলাকান্দিতে কিশোরদের মিছিল

আসামে কাছাড়, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি জেলা কমসোমলের যৌথ উদ্যোগে ১৯-২১ জুলাই হাইলাকান্দি শহরের হরকিশোর হাইস্কুলে তিনদিনের একটি শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষা শিবিরের উদ্বোধন করেন এস ইউ সি আই (সি)-র রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড অরুণাংশু ভট্টাচার্য। বিভিন্ন অধিবেশনে কমসোমলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য ভবতোষ চক্রবর্তী, অজয় আচার্য ও ময়ূখ ভট্টাচার্য।

শিবিরের তৃতীয় দিন সকালে ভাষা শহিদ স্মারক গার্ড অব অনার প্রদর্শন করা হয়। ১৯৮৬ সালে আসাম সরকার ভাষিক সংখ্যালঘুদের ওপর জোর করে অসমীয়া ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার যে সার্কুলার জারি করে তা প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলন গড়ে ওঠে। সেই আন্দোলনের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে একটি সুসজ্জিত মিছিল শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। এ ছাড়াও শিবিরে শরীর চর্চা, খেলাধূলা ও নাটক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সিনেমা দেখানো হয়।

মগরাহাটে হাসপাতাল সংস্কার ও উন্নয়নের দাবিতে আন্দোলন

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় মগরাহাটে যুগদীয়া-বেনীপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সামগ্রিক উন্নয়নের দাবিতে ১৪ জুলাই হাসপাতাল মোড়ে বিশাল নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন প্রস্তুতি কমিটির যুগ্ম সভাপতি কবীর মোল্লা।

উপস্থিত ছিলেন মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের জেলা কমিটির সদস্য, বিশিষ্ট চিকিৎসক স্বাস্থ্য আন্দোলনের নেতা অদ্বয় ঘোষ, সামাজিক আন্দোলনের নেতা, বিশিষ্ট আইনজীবী সাইদুল ইসলাম, স্বাস্থ্য আন্দোলনের নেত্রী নাজিরা খাতুন, বিজ্ঞান সংগঠনের কর্মী মনীষা দিন্দা। উপস্থিত ছিলেন মুফতি হাবিবুল্লাহ এবং মুফতি জাকারিয়া। তাঁরা এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অতীত ইতিহাস এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উন্নয়নের বিষয়ে বক্তব্য রাখেন এবং আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানান। কবীর মোল্লাকে সভাপতি ও সোমনাথ নস্করকে সম্পাদক করে ৫০ জনের একটি আন্দোলন কমিটি গড়ে ওঠে।

মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে কৃষ্ণনগরে বিক্ষোভ

নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে ২৬ জুলাই কৃষ্ণনগর শহরের বেলেডাঙা বাজার এবং পাত্র বাজারে এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর পক্ষ থেকে বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভা হয়।

পথসভায় বক্তব্য রাখেন জেলা কমিটির সদস্য অঞ্জন মুখার্জী, জয়দীপ চৌধুরী, মশিকুর রহমান প্রমুখ। অবিলম্বে নিতপ্রয়োজনীয় জিনিসের আইন প্রয়োগ করে দাম নিয়ন্ত্রণ করা এবং রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করার দাবি জানানো হয়। নাগরিক কমিটি গঠন করে মূল্যবৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলনকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান বক্তারা।

সিইএসসিতে বিদ্যুৎ গ্রাহক বিক্ষোভ

একের পাতার পর

নেতৃত্বে প্রচার ও স্বাক্ষর সংগ্রহ চলেছে। লোকসভা নির্বাচনের সময় সিইএসসি ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ আর্থিক বর্ষে বকেয়া হিসাবে ২,৪৭১ কোটি টাকা আদায়ের জন্য রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনে আবেদন জানায়। এর বিরুদ্ধে অ্যাবেকা প্রতিবাদ জানিয়ে স্বাক্ষর সংগ্রহ শুরু করে। নেতৃবৃন্দ জানিয়েছেন, অতিরিক্ত সারচার্জ প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত তীব্র গ্রাহক আন্দোলন চলবে।

কানপুরে শহিদ স্মরণ

স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন ধারার বিপ্লবী শহিদ চন্দ্রশেখর আজাদের ১১৮তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ২৪ জুলাই উত্তরপ্রদেশের কানপুরে জনপ্রতিরোধ আন্দোলন সমিতি এক সভার আয়োজন করে। সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি বলেন্দ্র কাটিয়ার, সঞ্চালনা করেন সম্পাদক রাজেশ কুমার। বহু বিশিষ্ট মানুষ, অধ্যাপক, শিক্ষক, শিক্ষাবিদ বক্তব্য রাখেন। তাঁরা চন্দ্রশেখর আজাদের বিপ্লবী শিক্ষা তুলে ধরে তা থেকে আজকের ছাত্র-যুবদের শিক্ষা নেওয়ার কথা বলেন।

বাজেটে বরাদ্দ নেই, ক্ষুব্ধ ঘাটালবাসী

কেন্দ্রীয় বাজেটে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানে কোনও অর্থ বরাদ্দ না হওয়ায় পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরের বানভাসিদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। প্রতিবাদে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটি ২৫ জুলাই ঘাটালের বরদা চৌকান থেকে কলেজ মোড় পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিল ও পদযাত্রা এবং পাঁশকুড়া বাসস্ট্যান্ডে বাজেটের প্রতিলিপি পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখায়। নেতৃত্ব দেন কমিটির কার্যকরী সভাপতি সত্যসাধন চক্রবর্তী, যুগ্ম সম্পাদক নারায়ণচন্দ্র নায়ক ও দেবাশীষ মাইতি।

উপস্থিত ছিলেন অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলা বন্যা-ভাঙন প্রতিরোধ কমিটির পঞ্চানন প্রধান, বন্দর ব্রিজ নির্মাণ সংগ্রাম কমিটির সভাপতি বলাইচন্দ্র পাড়ুই, সাহেবঘাট ব্রিজ নির্মাণ সংগ্রাম কমিটির যুগ্ম সম্পাদক কানাইলাল পাখিরা, কৃষক সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি গোপাল সামন্ত, ঘাটাল-রানিচক নদীবাঁধ রক্ষা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক প্রসেনজিৎ কাপাস ও অর্ধেন্দু মাজী প্রমুখ। বাজেটের প্রতিলিপিতে অগ্নিসংযোগ করেন কমিটির সভাপতি ডাঃ বিকাশ চন্দ্র হাজরা। বিক্ষোভ সভায় সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক গৌরীশঙ্কর বাগ, বিদ্যাসাগর গবেষক হরগোবিন্দ দোলই। প্রায় তিন শতাধিক ভুক্তভোগী মানুষ বিক্ষোভে সামিল হন।

শ্রীরামপুরে হাসপাতালে অব্যবস্থা ঃ সুপারকে ডেপুটেশন

১৮ জুলাই হুগলি জেলার শ্রীরামপুর ওয়ালস্ হাসপাতালে পর্যাপ্ত ডাক্তার-স্বাস্থ্যকর্মী-চিকিৎসা সরঞ্জামের দাবিতে হাসপাতাল সুপারকে ডেপুটেশন দিল এস ইউ সি আই (সি) শ্রীরামপুর আঞ্চলিক কমিটি। বর্তমানে এই হাসপাতালটি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল। সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা ছিল যে, তারা বিনামূল্যে উন্নত সরকারি চিকিৎসা পরিষেবা পাবে। কিন্তু উন্নত পরিষেবা পাওয়া তো দূরের কথা, সাধারণ মানের পরিষেবা থেকেও মানুষ বঞ্চিত। ইন্ডোর বিভাগে পর্যাপ্ত ডাক্তার-স্বাস্থ্যকর্মী নেই। সবগুলি বিভাগ মিলিয়ে একটি মাত্র ইউএসজি মেশিন, ফলে রোগীকে এই পরিষেবা পেতে এক মাসেরও বেশি সময় অপেক্ষা করতে হয়। দাঁতের এক্স-রে মেশিন ও বিভিন্ন রক্তপরীক্ষা সহ অধিকাংশ প্যাথলজিকাল পরীক্ষার ব্যবস্থা নেই, রোগীকে বেসরকারি সংস্থা থেকে অর্থ ব্যয় করে পরীক্ষা করাতে হয়। আউটডোরে সমস্ত বিভাগের ডাক্তার নেই। এই সমস্যাগুলি সমাধানের দাবিতে হাসপাতাল সুপারকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। তিনি দাবিগুলির সাথে সহমত প্রকাশ করেন ও সমাধানে সচেষ্ট হওয়ার আশ্বাস দেন।

কেন্দ্রীয় কমিটির বিবৃতি

একের পাতার পর

'অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট' কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পেশই করেননি। ফলে আগের বছরগুলিতে বিভিন্ন নীতি রূপায়ণের ক্ষেত্রে সরকারের কাজের বাস্তব চেহারা কী, তা নিয়ে জনসাধারণকে অন্ধকারে রাখা হল। যার ফলে দেশবাসীর ক্রমবর্ধমান দুর্দশা, অভাব-অনটন, আয় কমে যাওয়া, বেকারত্ব, ছাঁটাই সহ যে সমস্ত সমস্যা তাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে, সেগুলির ব্যাপারে দেশের মানুষের কাছে উত্তর দেওয়ার দায়বদ্ধতাকেই সরকার অস্বীকার করেছে। অন্য দিকে একচেটিয়া মালিকদের করছাড় এবং সহজে ব্যবসা-বাণিজ্য করার নীতি জোরদার করার নামে নানা অর্থনৈতিক উৎসাহ-ভাতা সহ একগুচ্ছ সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার মধ্য দিয়ে তাদের প্রতি সরকারের পক্ষপাতিত্বই ধরা পড়েছে।

নিয়মরক্ষার খাতিরে কর্মসংস্থান সৃষ্টির কথা বলতে গিয়ে নিছক কিছু দক্ষতা বৃদ্ধির পদক্ষেপের ইঙ্গিত করা হয়েছে। মাসিক মাত্র ৫ হাজার টাকা ভাতায়, স্থায়ী চাকরির কোনও নিশ্চয়তা ছাড়াই এক বছরের জন্য কোম্পানিগুলিতে শিক্ষানবিশির কথা বলা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে ঘুরপথে মালিকদের সস্তা শ্রমিক জোগানোর পাশাপাশি বাড়তি আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

অর্থমন্ত্রী দাবি করেছেন, তালিকাভুক্ত ২২টি ফসলের ক্ষেত্রে উৎপাদন খরচের ওপর ৫০ শতাংশ হারে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি) বাড়ানো হয়েছে। এটা যে আসলে কৃষকদের দাবি অনুযায়ী প্রকৃত উৎপাদন খরচের দেড়গুণের অনেক কম, সে সত্যকে চাপা দেওয়া হচ্ছে। আমরা বাজেটের নামে এই প্রহসনের তীব্র নিন্দা করছি। এই সার্বিক কর্পোরেট স্বার্থবাহী বাজেটের বিরুদ্ধে সারা দেশের নিপীড়িত মানুষের প্রতি ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদের আহ্বান জানাচ্ছি।

কী দিলেন অর্থমন্ত্রী

দুয়ের পাতার পর

সৃষ্টির দায়িত্বটি সরকার নিজের কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সম্পূর্ণ ভাবে বেসরকারি মালিকদের উপরেই চাপিয়ে দিতে চায়। তাই সরকারি দফতরগুলিতে ফাঁকা পড়ে থাকা ১০ লক্ষ পদ পূরণের কোনও ইঙ্গিতই এ বারের বাজেট ভাষণে পাওয়া যায়নি।

অর্থমন্ত্রী কর্মসংস্থান সংক্রান্ত তিনটি প্রকল্প ঘোষণা করেছেন। ভাষার ধোঁয়াশা সরিয়ে যেটুকু সামনে এসেছে তা হল, প্রথম প্রকল্প অনুযায়ী, প্রভিডেন্ট ফান্ডের খাতায় নাম ওঠা নতুন কর্মীদের প্রথম মাসের মাইনে তিন কিস্তিতে ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত দেবে সরকার। এ ব্যবস্থা এক বছরের জন্য। এক বছর পরে ওই কর্মীদের চাকরি আদৌ থাকবে কি না, সে ব্যাপারে মন্ত্রী কিছু বলেননি। দ্বিতীয় প্রকল্পে বলা হয়েছে, শিল্প ক্ষেত্রে নতুন কর্মীদের পিএফ-এর টাকা দেবে সরকার। কর্মী পিছু যে টাকা মালিক ইপিএফ-এ জমা দিতে বাধ্য, চার বছর ধরে সে টাকাও সরকারই দেবে। এতে নাকি ৩০ লক্ষ বেকারের চাকরি হবে। কিন্তু এই হিসাব কোথা থেকে পেলেন, অর্থমন্ত্রী কিন্তু সে কথা জানাননি। তা ছাড়া, মালিকরা পিএফ-এর টাকা দিতে পারে না বলেই নিয়োগ হয় না, সরকার তা দিয়ে দিলেই লাখ লাখ যুবকের কাজের ব্যবস্থা হবে— এমন ধারণা অর্থমন্ত্রীর চিন্তায় এল কোথা থেকে, সেটাই বিস্ময়ের।

তৃতীয় প্রকল্পটি আরও সরেশ। বলা হয়েছে, দেশের শীর্ষ ৫০০টি বেসরকারি সংস্থায় ১ কোটি ছেলেমেয়ের এক বছরের শিক্ষানবিশির ব্যবস্থা করা হবে। সরকার প্রত্যেক শিক্ষানবিশকে মাসে ৫ হাজার টাকা করে দেবে। অর্থাৎ বছরে শিক্ষানবিশ পিছু সরকার খরচ করবে ৬০ হাজার টাকা। কাজ শেখার বাকি খরচ সংস্থার মালিক বহন করবে। অর্থাৎ, বেসরকারি সংস্থাগুলিকে শিক্ষানবিশ নিয়োগের নামে এক বছর ধরে নামমাত্র খরচের বিনিময়ে শ্রমিক জোগানের ব্যবস্থা করে দিল সরকার। কিন্তু মূল সমস্যা অন্য জায়গায়। অর্থমন্ত্রীর হিসাব অনুযায়ী প্রতিটি সংস্থাকে ২০ হাজার শিক্ষানবিশ নিতে হবে। এদিকে পরিসংখ্যান বলছে, দেশের মাত্র ১৩৭টি সংস্থায় ১০ হাজারের বেশি কর্মী আছে। এই অবস্থায়, যাদের নিজস্ব কর্মীসংখ্যাই ১০ হাজারের কম, তারা কেমন করে ২০ হাজার শিক্ষানবিশকে প্রশিক্ষণ দিতে পারবে? এ প্রশ্নের উত্তর দেননি অর্থমন্ত্রী। শিক্ষানবিশির পর কর্মীরা কাজ পাবে কি না, পেলেও কোথায় পাবে, সে সব কথার জবাবও তাঁর কাছে নিশ্চিত ভাবেই নেই।

অর্থবরাদ্দ বাড়েনি একশো দিনের কাজ প্রকল্পে

অর্থমন্ত্রীর নিশ্চয় এ কথা অজানা নয় যে, অর্থনীতিতে কার্যকরী চাহিদা অর্থাৎ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা থাকলে তবেই সচল থাকে শিল্প-উৎপাদন, ঘোরে কল-কারখানার চাকা। এবং আজকের দিনে অর্থনীতির মূল সমস্যা এই ক্রয়ক্ষমতার অভাবই। তা সত্ত্বেও কী করে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের হাতে ব্যয়যোগ্য টাকা তুলে দেওয়া যায়, তা নিয়ে বাজেটে মাথা ঘামায়নি বিজেপি সরকার। একশো দিনের কাজ প্রকল্প, যা গ্রামীণ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, এ বারের বাজেটে তাতে বরাদ্দ সামান্য পরিমাণও বাড়ানো হয়নি। মূল্যবৃদ্ধিকে হিসাবে নিলে কার্যত এই প্রকল্পে বরাদ্দ আগের বছরের তুলনায় বেশ খানিকটা কমে গেছে।

প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দের বান

জনজীবনের মানোন্নয়নের জন্য পুষ্টি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের মতো ক্ষেত্রগুলিতে মুষ্টিভিক্ষার মতো করে অর্থবরাদ্দ হলেও প্রতিরক্ষা খাতে কিন্তু বিজেপি সরকার দরাজ হাতে টাকা ঢেলে দিয়েছে। এ বারের বাজেটে সমস্ত ক্ষেত্রগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে এই প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রটিতেই— ৬ লক্ষ ২১ হাজার ৯৪০ কোটি টাকা, বাজেটে মোট বরাদ্দ অর্থের প্রায় ১৩ শতাংশ। বোঝা যায়, বিজেপি সরকার বিপুল মিলিটারি বাহিনী ও অস্ত্রশস্ত্রের জোরেই দেশকে শক্তিশালী করতে চায়। সুস্বাস্থ্য, সুশিক্ষা, আনন্দ ও মর্যাদাময় জীবনের অধিকারী জনসাধারণই যে একটি দেশের আসল শক্তি— সে বোধ তার নেই।

আর্থিক বৈষম্য কমানোর বদলে বাড়ানোর বন্দোবস্ত বাজেটে

বাস্তবে রুজি-রোজগারের বন্দোবস্ত সহ সংখ্যাগরিষ্ঠ খেটে-খাওয়া মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের কোনও চেষ্টাই এবারের বাজেটে দেখা যায়নি। অথচ অর্থনৈতিক বৈষম্যের বীভৎস চেহারা ক্রমাগত প্রকট হচ্ছে। ওয়ার্ল্ড ইনইকুয়ালিটি ল্যাবের সাম্প্রতিক রিপোর্ট বলছে, বর্তমানে দেশের মাত্র ১ শতাংশ ধনীতম মানুষের হাতে ৪০ শতাংশেরও বেশি সম্পদ জমা হয়েছে। এ বছরের আর্থিক সমীক্ষাতেও দেশের এই ভয়ঙ্কর অর্থনৈতিক বৈষম্যকে একটি গুরুতর সমস্যা হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। অথচ বাজেটে মানুষে মানুষে আর্থিক ব্যবধান কমিয়ে আনার কোনও উদ্যোগ দেখা গেল না। বরং উচ্চ আয়ের মানুষ ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে এই বাজেটে যে ভাবে কর ছাড় দেওয়া হল, তাতে এই বৈষম্য আরও বৃদ্ধি পাবে। এ বারের বাজেটে নতুন কর-কাঠামোয় তুলনায় অল্প রোজগারের উপর কর চাপানো হল। যেমন, প্রথাগত কর-ছাড় বাদ দিয়ে এখন থেকে ৪ লক্ষ টাকা বার্ষিক রোজগারের উপর কর দিতে হবে, আগে যা করমুক্ত ছিল। আবার, যাদের ব্যক্তিগত রোজগার ১৫ লাখের বেশি, তাদের জন্য করের হার ধার্য করা হয়েছে ৩০ শতাংশ। অথচ কর্পোরেট তথা একচেটিয়া সংস্থায় যাদের রোজগার বছরে ১০ কোটি টাকা পর্যন্ত, তাদের ক্ষেত্রে করের হার করা হয়েছে ২৫ শতাংশ। বৈষম্যের ভয়ানক নজির ছাড়া একে আর কী বলা যায়! কর্পোরেট মুনাফা আরও বাড়ানোর জন্য ইতিমধ্যেই চালু রয়েছে যে সব সুযোগ-সুবিধা, সমাজে এই ভয়ঙ্কর আর্থিক বৈষম্য সত্ত্বেও, সে সবগুলিই কিন্তু অব্যাহত রাখা হয়েছে এই বাজেটে। বিদেশি সংস্থাগুলির জন্যও বাজেটে কর্পোরেট করের হার ৪০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৩৫ শতাংশ করার ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, এবারে বাজেটে কেন্দ্রীয় সরকার গরিবি-বেকারি-মূল্যবৃদ্ধিতে বিপন্ন দেশের কোটি কোটি মেহনতি মানুষের জীবনযন্ত্রণা লাঘবের সামান্য চেষ্টাও না করে দেশি-বিদেশি কর্পোরেট সংস্থার মালিকদের সম্পদ দিনে দিনে আরও বাড়ানোর বন্দোবস্ত সুচারু ভাবেই করে দিল। জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানোর আদৌ কোনও চেষ্টা না করে অর্থনীতির গতি বাড়াতে সমর-বিভাগই তাদের কাছে পাখির চোখ। ধসে পড়া অর্থনীতিকে টিকিয়ে রাখতে এবং একচেটিয়া পুঁজিমালিকদের মুনাফা অটুট রাখতে অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশের মতো অর্থনীতির সামরিকীকরণের পথই বেছে নিয়েছে বিজেপি সরকার।

বাস্তবে এটাই তাদের একমাত্র কাজ। মানুষকে আজ স্পষ্ট ভাবে এ কথা বুঝে নিতে হবে যে, পুঁজিবাদী ভারত রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রক পুঁজিপতি শ্রেণির রাজনৈতিক ম্যানেজার হিসাবেই কাজ করে এ দেশের সরকারগুলি। ফলে বাজেটের মাধ্যমেই হোক বা অন্য কোনও ভাবে, সর্বদাই তার লক্ষ্য জনসাধারণকে বঞ্চিত করে, তাদের উপর শোষণের রোলার চালিয়ে মালিক শ্রেণির মুনাফা ক্রমাগত বাড়িয়ে তোলা। মানুষের আজ এ কথা বুঝে নেওয়ার সময় এসেছে যে, ভোটের মাধ্যমে সরকার বদলে এই চূড়ান্ত অন্যায়ের সমাধান করা যাবে না। কেন্দ্রে আজ বিজেপি সরকারের বদলে অন্য দলের সরকার বসলেই জনজীবনে উন্নয়নের জোয়ার বইবে না। তা করতে গেলে উচ্ছেদ করতে হবে শোষণমূলক এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটিকেই।

কৃষককে বাঁচাতে হলে

তিনের পাতার পর

রিটেল চেন যখন আপেল-বাজারে ঢুকতে পারেনি তখন আপেল চাষিরা দাম পেত গড়পড়তা ৭০-৮০ টাকা কেজি দরে। এ একটা সামান্য উদাহরণ।

৫। বিজেপি সরকার কৃষিজ দ্রব্যের আমদানি রপ্তানি নীতির ব্যাপক পরিবর্তন করেছে। সবটাই করেছে দেশের খাদ্য ব্যবসায়ীদের মুনাফার কথা মাথায় রেখে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। কেন্দ্রীয় সরকার মিট সিন্ডিকেটকে অনুমতি দিয়েছে ইন্দোনেশিয়া থেকে সস্তায় দুধ আমদানি করার। এর ফলে দেশের লক্ষ লক্ষ দুধ-চাষির রুটি-রুজির সর্বনাশ হয়েছে। তৈলবীজ, আখ ইত্যাদির ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার তুলোর উপর আমদানি শুল্ক ৩০ শতাংশ কমিয়ে দিয়েছে। এর ফলে দেশের লক্ষ লক্ষ তুলো চাষির সমূহ সর্বনাশ হয়েছে।

৬। ২০১৬ সালে বিজেপি সরকার মডেল এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড লিজ অ্যাক্ট প্রণয়ন করে। উদ্দেশ্য হল কৃষি জমিকে অকৃষি কাজে ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া। এই আইনবলে লক্ষ লক্ষ একর কৃষি জমি বহুজাতিক পুঁজির হাতে দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

৭। বিজেপি সরকার ২০২০ সালে ন্যাশনাল হাইওয়ে অ্যাক্ট সংশোধন করে জমি অধিগ্রহণের এক বিরাট পরিকল্পনা করেছে। এই আইন অনুযায়ী সরকার জাতীয় সড়কের উভয় পাশের ২ কিলোমিটার পর্যন্ত জমি কৃষকের সম্মতি না নিয়েই অধিগ্রহণ করতে পারবে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সরকার বাস্তবে কয়েক কোটি একর জমি অধিগ্রহণের আওতায় নিয়ে এল।

৮। বিজেপি সরকার বিভিন্ন কৃষিপণ্যের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই চুক্তি চাষ চালু করেছে।

৯। ফসল বিমার ক্ষেত্রে বিজেপি সরকার এক চূড়ান্ত ধাপ্পাবাজির আশ্রয় নিয়েছে। নাম দেওয়া হয়েছে প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা। কিন্তু বাস্তবে এটা কী? এই যোজনা অনুযায়ী কৃষককে বিমার প্রিমিয়াম দিতে হবে বহুজাতিক কোম্পানিকে। এই কোম্পানি ঠিক করবে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ। এর ফলে বহুজাতিক বিমা কোম্পানির পোয়াবারো হয়েছে। তারা জমা প্রিমিয়ামের ৯৭ শতাংশ টাকাই সরিয়ে ফেলছে। বিপুল মুনাফা লুটছে। চাষিদের সাহায্য করার নামে তাদের দুঃখ নিয়ে এ এক অদ্ভুত ধরনের ব্যবসা।

১০। বিজেপি সরকার একশো দিনের কাজের গুরুত্ব কমিয়ে দিয়েছে। এক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দ আগের তুলনায় অনেক কম। তার আবার সবটা খরচ করা হয় না। আইনকে এমন জটিল করা হচ্ছে যার উদ্দেশ্য হল কেউ যেন কাজ করার উৎসাহ বোধ না করে। এই ভাবে একশো দিনের কাজের আইনকে বাস্তবে অকার্যকর করে ফেলা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের এই সমস্ত কৃষক বিরোধী আইন পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল সরকার উৎসাহের সাথে কার্যকর করছে। এই সব প্রশ্নে এদের মধ্যে কোনও বিরোধ নেই। একশো দিনের কাজের ক্ষেত্রে তৃণমূল নেতাদের দুর্নীতি সীমাহীন। ফলে এই রাজ্যে এই আইনে কাজ পাওয়ার বিষয়টি প্রহসনে পরিণত হয়েছে। ২০১৪ সালে তৃণমূল সরকার চুক্তি চাষ সংক্রান্ত আইন তৈরি করেছে। ২০১৯ সালে করেছে জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত আইন। সেই আইনে এ কথা বলা হয়েছে, কৃষকের সম্মতি না নিয়েও তার জমি অধিগ্রহণ করা যাবে। বৃহৎ পুঁজির রিটেল চেনকে রাজ্যে খুচরো ব্যবসায় বাধাহীন ভাবে কাজ করতে দেওয়ার জন্য 'সিঙ্গল উইন্ডো সিস্টেম' বা 'এক জানালা ব্যবস্থা' চালু করা হচ্ছে। ধান কিছুটা কেনা ছাড়া রাজ্য সরকার আর কোনও ফসল কেনার ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ করে না। পাট এই রাজ্যের ফসল। দেশের ৭০ শতাংশ পাট এই রাজ্যে তৈরি হয়। ১৫ লক্ষ পাটচাষি পরিবার এর সাথে যুক্ত। অথচ রাজ্য সরকার এক কেজি পাট কোনও দিন কেনেনি। এই হল কৃষকের ফসল কেনার ক্ষেত্রে রাজ্যের তৃণমূল সরকারের অবস্থা।

এই সমস্ত ঘটনায় দেখা যাচ্ছে, কেন্দ্রের ও রাজ্যের সব সরকারই একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থেই সমস্ত নিয়ম কানুন প্রণয়ন করেছে এবং এখনও করে যাচ্ছে। একে বলা যায় রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বেসরকারিকরণ। অর্থাৎ, গুটিকতক পুঁজিপতির স্বার্থে কোটি কোটি কৃষক খেতমজুরের সর্বনাশ। যাঁরা পুঁজিপতিদের ধামাধরা সেই সব বুদ্ধিজীবীদের এতে কোনও আপত্তি নেই। ওঁরা মনে করেন, এটাই স্বাভাবিক। মনে করেন গরিব মানুষের জীবনের মূল্য কী, তারা তো মরবেই। ওঁদের মতে ধনীর ধনস্ফীতিই হল উন্নয়ন। সেই উন্নয়নের জন্য কাজ করাই হল রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

কিন্তু নিপীড়িত শোষিত কৃষক-মজুর তো বাঁচতে চাইবেনই। তাঁরা তো চাইবেনই রাষ্ট্র এমন ব্যবস্থা করুক যাতে তাঁরা ধনে প্রাণে মারা না পড়েন, যাতে তাঁদের সন্তান সন্ততি দু-বেলা দু-মুঠো খেতে পায়, রোগ হলে চিকিৎসা পায়, শিক্ষার আলো পায়। তার জন্য কৃষিকাজ লাভজনক হতেই হবে। দুটো পয়সা হাতে থাকতে হবে।

সাতের পাতায় দেখুন

দোকান-মালিকদের ধর্মীয় পরিচয়ের নির্দেশ বিশেষ মতলবেই

কাঁওয়ার যাত্রা

উত্তরাখণ্ডের কাঁওয়ার বা শিবভক্তদের যাত্রা বহু বছর ধরে চলছে। কিন্তু এ বছরই হঠাৎ যাত্রাপথের দোকানদারদের পরিচয় লিখে রাখার কথা উত্তরপ্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ড সরকারের মাথায় এল কেন? আপাতত সুপ্রিম কোর্টের রায়ে ব্যাপারটা স্থগিত হলেও বিষয়টা ভাবিয়েছে সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে। তাঁরা ব্যথিত, উদ্বিগ্ন।

উত্তর ভারত বিশেষত উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড এই দুটি রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মানুষ বছরের পর বছর ধরে কাঁওয়ার যাত্রা করে থাকেন। শ্রাবণ মাসে হরিদ্বারের গঙ্গা থেকে জল নিয়ে শিবের মাথায় ঢালতে মাইলের পর মাইল খালি পায়ে পাড়ি দেন তারা। হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, দিল্লি থেকে পুণ্যার্থীরাও এই যাত্রায় অংশ নেন। কুম্ভে বা কাশ্মীরে অমরনাথ যাত্রার মতো এতেও প্রশাসনের বিশেষ নজরদারি থাকে, যাতে আগত অসংখ্য মানুষের কোনও অসুবিধা না হয়। সে তো প্রতিটি রাজ্যেই নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ভিড় সামলাতে সরকার এবং প্রশাসনকে তৎপর হতে হয়। কিন্তু এবার হঠাৎ কাঁওয়ার যাত্রা গোটা দেশে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়াল কেন? কেনই বা তড়িঘড়ি জারি হল প্রশাসনিক নির্দেশিকা? কেনই বা সর্বোচ্চ বিচারালয়কে হস্তক্ষেপ করতে হল? কারণ প্রথমে মুজফফরনগর, পরে গোটা উত্তরপ্রদেশের প্রশাসন কাঁওয়ার যাত্রাপথের সর্বত্র বাধ্যতামূলক ভাবে খাবারের দোকানের মালিকদের নাম ও ফোন নম্বর টাঙানোর সরকারি নির্দেশিকা জারি করে বলেছে, নির্দেশিকা না মানলে মোটা টাকা জরিমানা করবে বা আইনি ব্যবস্থা নেবে। উত্তরাখণ্ডের বিজেপি সরকার ও বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশও একই পথে হাঁটে।

সরকারের এই সিদ্ধান্তে যাত্রাপথের কয়েকশো ধাবা মালিক এবং হাজারে হাজারে কর্মচারী আশঙ্কায় পড়েন, প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে ধাবা বন্ধ করতে হলে তাদের রুটি-রুজি বিপন্ন হবে। তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট পরিজনরাও সংকটে পড়বেন। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে বহু বছর ধরে গড়ে ওঠা প্রীতির সম্পর্কও ক্ষুণ্ণ হবে। জানা গেছে, ২০২৩-এ এক নির্দেশিকায় সংখ্যালঘুদের ধাবা চিহ্নিত করে সেগুলি বন্ধ করে দিয়েছিল যোগী সরকার। বর্তমানে ২৩০ কিলোমিটার সুদীর্ঘ কাঁওয়ার যাত্রাপথে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মালিকদের যে কোনও ধরনের দোকান (খাবার, মুদি, ফল, সবজি পর্যন্ত) বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয় বিজেপি সরকার, যদি তাঁরা নিজেদের নাম দোকানের সামনে লিখে না রাখেন। এমনকি সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় স্থানগুলিকেও কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। অর্থাৎ এই পরিকল্পনা হঠাৎ করে নেওয়া হয়নি।

কোনও মানুষ কী খাবে না খাবে, কে কোন ধর্মাচরণ করবে এটা একটা গণতান্ত্রিক দেশে নাগরিকের নিজস্ব বিষয়। গণতন্ত্রের যতটুকু ঠাটবাট রয়েছে, সে ক্ষেত্রে এই অধিকারে সরকার হস্তক্ষেপ করতে পারে কি? নানা ধর্ম-বর্ণের মানুষ পরস্পরের ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবে একসাথে আনন্দ উপভোগ করেন, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। এটাই সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক আচরণ। এই সম্প্রীতির পরিবেশটিকে ভাঙাই বিজেপির লক্ষ্য। সেই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতেই এমন অগণতান্ত্রিক, অপমানজনক শর্ত চাপানো হচ্ছে। 'কাঁওয়ারি'দের নিরাপত্তার অজুহাত তুলে ধাবা মালিকদের নেমপ্লেট লাগানোর নির্দেশ দিয়েছে সরকার, তা না লাগানোর ফলে যাত্রী নিরাপত্তা কী ভাবে বিঘ্নিত হচ্ছিল, কোথাও বলা হয়নি। আসলে সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় পরিচয় প্রকাশ্যে এনে তাদের 'ওরা' বলে দাগিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই সরকারের এই ঘৃণ্য পদক্ষেপ।

গণতান্ত্রিক সমস্ত মানুষ দলমত নির্বিশেষে এই ঘৃণ্য পদক্ষেপের নিন্দা করছেন তীব্র ভাষায়। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে স্থানীয় ধাবা মালিক এবং তাঁদের কর্মচারীরা বলছেন, 'আগে প্রতি বছর আমরা সমস্ত যাত্রীদের পরিষেবা দিয়েছি। তাঁরাও জানতে চান না আমাদের ধর্মপরিচয়, আমরাও পরম বিশ্বাসে তাঁদের হাতে খাবার, ফল তুলে দিই। এমনকি যাত্রাপথে আহতদের শুশ্রূষা করে সুস্থ করে তুলি। মানুষ হিসাবে মানুষের পাশে দাঁড়াই। এর সাথে যেমন আমাদের জীবন-জীবিকা যুক্ত, তেমনই রয়েছে মানবিকতাও।' এই ঐক্যের ছবিই আঁকা রয়েছে কাঁওয়ার যাত্রাপথে সামলি, শাহরানপুর, মুজফফরনগর, বিজনৌর, খাটাউলি প্রভৃতি এলাকার মানুষের মনে!

আর এই একতাকেই ভয় পেয়ে তাতে ফাটল ধরাতে চায় বিজেপি সহ শাসক দলগুলি। তারা চায় হিন্দু-মুসলিম, উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণের মানুষ পরস্পরকে সন্দেহের চোখে দেখুক। পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত হোক। এ ভাবে তাদের মধ্যে বিভাজনের বীজ ছড়িয়ে দিয়ে শাসকরা নিজেদের অপদার্থতা ঢাকতে চায়। দেশে কেন এত বেকার, কেন মূল্যবৃদ্ধিতে জেরবার হচ্ছে মানুষ, কেন অনাহারে মারা যাচ্ছে অসংখ্য শিশু, কেন চিকিৎসা না পেয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে গরিবরা— এই অসংখ্য অপ্রিয় কেন-র উত্তর যাতে না দিতে হয়, তার মোকাবিলায় বিভেদ-রাজনীতি মহৌষধ। তাই তাকেই হাতিয়ার করেছে শাসক দল।

কাঁওয়ার যাত্রাপথে সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরু বিদ্বেষ তৈরির অন্যতম কারণ গোটা দেশের সংখ্যালঘুদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক করে রেখে শাসকের কাছে নতজানু হতে বাধ্য করা, অন্যদিকে উগ্র হিন্দুত্বে সুড়সুড়ি দিয়ে দেশের সংখ্যাগুরু ভোটব্যাঙ্ককে নিজেদের কবজায় রাখা। দেশের বেশিরভাগ মানুষ যাতে ধর্মের আফিমে বুঁদ হয়ে থেকে শাসকদের বদমায়েসি ধরতে না পারে, বুঝতে না পারে এই দলগুলির পৃষ্ঠপোষক পুঁজিবাদী এই ব্যবস্থাটাই তাদের হতদরিদ্র অবস্থার জন্য দায়ী— সে জন্যই শাসকের এই কৌশল।

শুধু কিছু মৌখিক বিবৃতি কিংবা আইনি বিরোধিতার পথে এই বিদ্বেষ-রাজনীতির মোকাবিলা করা যাবে না। ক্ষমতাসীন দলগুলি ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য, বিরোধী দলগুলি ক্ষমতার দখল নেওয়ার জন্য সুযোগ পেলেই বিদ্বেষ রাজনীতিকে কাজে লাগায়। তাই বর্তমান ভোটসর্বস্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখে এই ধর্ম-বর্ণের বিভেদকে দূর করা যাবে না, একমাত্র ধর্মনিরপেক্ষ তথা সেকুলার চিন্তার ব্যাপক চর্চা সমাজে ছড়িয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়েই একে কিছুটা হলেও সংযত করা যেতে পারে— যে চিন্তার চর্চা ভোটসর্বস্ব এই দলগুলি কেউই করে না। প্রকৃত গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র কায়েম করতে হলে বদলাতে হবে এই সমাজ ব্যবস্থাকেই। নতুন সমাজ গঠনের সংগ্রাম যারা চালাচ্ছে, আজ তাদেরই শক্তিশালী করতে হবে।

কৃষককে বাঁচাতে হলে

ছয়ের পাতার পর

আর এটা করতে চাইলে, সরকারকে দুটো কাজ করতেই হবে। এক, চাষের খরচ কমানো। অর্থাৎ, সার, বীজ, বিদ্যুৎ ইত্যাদির দাম কমাতে হবে এবং সরকারকেই এই দায়িত্ব পালন করতে হবে। কারণ, বেসরকারি মালিকরা এই কাজ করে না, করতে পারে না। সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের জন্য তারা সর্বোচ্চ শোষণ করবেই। দেখা গেছে, সার বীজ তেল বিদ্যুৎ একচেটিয়া পুঁজির হাতে চলে যাওয়ার ফলে বাজারে তার দাম বেড়েছে বহুগুণ। তাই কৃষকরা দাবি তুলেছে কৃষি উৎপাদনের জন্য এই সব প্রয়োজনীয় শিল্পসামগ্রী সস্তায় সরকারকেই সরাসরি সরবরাহ করতে হবে।

দুই, ফসল লাভজনক দামে বিক্রি করার সুব্যবস্থা। বেসরকারি মালিকরা এটাও করবে না। তারা ফসল কেনার সময় কৃত্রিমভাবে দাম কমিয়ে দেবে। কৃষকের ফসল কম দামে কিনে গুদামজাত করবে, বিপুল মুনাফা লুটবে। এদের হাতে যদি কৃষিবিপণন ব্যবস্থা ছেড়ে দেওয়া হয় তবে কৃষকের সর্বনাশ, সর্বনাশ সাধারণ মানুষেরও। হচ্ছেও তাই। স্বাভাবিকভাবে কৃষকরা একচেটিয়া পুঁজির এই সর্বাত্মক আক্রমণের হাত থেকে মুক্তি চাইছে। তাই তারা দাবি তুলেছে ২৩টি কৃষিজ দ্রব্যের উপর এমএসপি চালু করো, এমএসপি-কে আইনসঙ্গত করো, প্রকৃত উৎপাদন খরচের দেড় গুণ দাম দিয়ে (C2+50%) কৃষকের ফসল কিনে নাও, খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যে ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতিদের প্রবেশ বন্ধকরো। কিন্তু একচেটিয়া পুঁজির ক্রীতদাস বিজেপি সরকার ও ধামাধরা বুদ্ধিজীবীরা বলছেন— কী অসম্ভব দাবি! এত টাকা কোথায়? এ তো রাজকোষ ফাঁকা করে দেওয়ার চক্রান্ত!

টাকা কোথা থেকে আসবে সেই আলোচনায় একটু পরে আসছি। কিন্তু তার আগে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করা দরকার। বিষয় হল, সরকারের কাজ কী? সরকারের প্রাথমিক কাজ হল সাধারণ মানুষের খাদ্য- বস্ত্র- বাসস্থান-শিক্ষার ব্যবস্থা করা। সমস্ত সভ্য সরকারেরই এটা প্রাথমিক দায়িত্ব। আমাদের দেশে সরকার এই দায়িত্ব পালন করছে না। তারা সবকিছুকেই পণ্যে পরিণত করেছে। অর্থাৎ সবকিছুই জনগণকে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কিনতে হবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য ইত্যাদি সবকিছু। সরকার হল এমন এক পরিবারের প্রধান যার পরিবারের সদস্যদের খাওয়াবার দায়িত্ব নেই, লেখাপড়া শেখাবার দায়িত্ব নেই, রোগ হলে চিকিৎসা করানোর দায়িত্ব নেই। পরিবারের এমন প্রধানের আমাদের প্রয়োজন কী? কিন্তু এই সরকার কিছুই করে না তা তো নয়! এরা ক্ষুধার্ত জনগণকে লাঠি-গুলি-টিয়ারগ্যাস উপহার দেয়। কালা কানুন জারি করে জনগণের প্রতিবাদের কণ্ঠকে সবলে চেপে ধরতে চায়। কৃষকরা এই সরকারের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তাই দিল্লি আন্দোলনের সময় তাঁরা স্লোগান তুলেছিলেন 'কর্পোরেট হামারা দুশমন হ্যায়'— একচেটিয়া পুঁজিপতিরা আমাদের শত্রু। আর সরকার হল এই একচেটিয়া পুঁজির সেবাদাস।

এই পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে যাওয়ার ক্ষমতা কোনও সরকারের নেই। তাই বছর বছর ওরা যে নীতি গ্রহণ করে তাতে জনগণের সর্বনাশ হয়, পুঁজিপতিদের হয় পৌষমাস। এই কারণে এই সরকারগুলো টাকার অভাবের অজুহাত দেখায়। না হলে হিসাবকষে বারবার দেখানো হয়েছে ২৩টি কৃষিপণ্যের এমএসপি চালু করে সরকার কৃষকদের কাছ থেকে খরচের দেড়গুণ দরে ফসল কিনে সাধারণ মানুষের কাছে সস্তা দরে তা বিক্রির ব্যবস্থা করলে অর্থাৎ এক কথায় সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করলে সরকারের কোষাগার থেকে কত টাকা খরচ হতে পারে? বর্তমান ব্যয়ের উপর মাত্র দেড় লক্ষ থেকে দুই লক্ষ কোটি টাকা। এই টাকাটা দেশের মানুষেরই টাকা। দেশের ১৪০ কোটি মানুষের জন্য এই সামান্য টাকা খরচ করার ক্ষমতা সরকারের যদি না থাকে, তাহলে সরকার মাত্র কয়েকটা পুঁজিপতি গোষ্ঠীকে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা কর ছাড়, আমদানি শুল্ক রপ্তানি শুল্ক মকুব, অনাদায়ী ব্যাঙ্ক ঋণ মকুব করে কী করে?

এই সহজ প্রশ্নের উত্তর বিজেপি সরকারের নেতা-মন্ত্রীরা দিতে পারবেন না, জবাব দিতে পারবেন না একচেটিয়া পুঁজির ধামাধরা অর্থনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীরাও। তাই সাধারণ মানুষের জন্য যখন অর্থ খরচের দাবি ওঠে তখন এরা নানা কু-যুক্তি হাজির করে, সমস্বরে বলে ওঠে— বেসরকারি উদ্যোগকে দুর্বল করা চলবে না। এর অর্থ হল, জনগণের ট্যাক্সের টাকা পুঁজিপতিদের পকেটে গুঁজে দাও, দেশের জল জঙ্গল জমি খনিজ সম্পদ সব দিয়ে দাও আদানি-আম্বানিদের মতো হাঙরদের পকেটে। জনগণের সর্বনাশ হলে হোক।

কৃষকরা লড়ছেন এই সর্বনাশা ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য। তার কিছুটা নমুনা আমরা দেখেছি দিল্লির কৃষক আন্দোলনে। ১৩ মাস ব্যাপী এই ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনে ৭৫০ জন কৃষক আত্মাহুতি দিয়েছেন। সগর্বে তাঁরা বলেছেন, আমরা লড়বো আমরা জিতবো। তাঁরা মোদি সরকারকে বাধ্য করেছিলেন তিনটি কালা কৃষি আইন প্রত্যাহার করতে। এই পথ অনুসরণ করেই দেশের কৃষকরা আবার প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন, আবার তাঁরা লড়বেন, আবার তাঁরা শাসক-শোষকের বুকে কাঁপন ধরিয়ে দেবেন। এই প্রক্রিয়া অবিরাম চলতেই থাকবে এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবসান না হওয়া পর্যন্ত।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

গণদাবী GANADABI Volume: 77, No.: 1 Bengali Weekly Auguat 2, 2024 Kolkata Price: Rs. 3.00

২৩ জুলাই কেন্দ্রের এবং ওড়িশার বিজেপি সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে ভুবনেশ্বরে এসইউসিআই(সি)-র বিক্ষোভ। নেতৃত্ব দেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও রাজ্য সম্পাদক কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্ত ও রাজ্য নেতৃবৃন্দ। রাজ্যপালের কাছে ও বিধানসভায় স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

বিপ্লবী চন্দ্রশেখর আজাদকে স্মরণ করায় ছাত্রদের বিরুদ্ধে এফআইআর মধ্যপ্রদেশে

আপসহীন বিপ্লবী চন্দ্রশেখর আজাদের ১১৮তম জন্মজয়ন্তী পালনের অভিযোগে ছাত্রদের বিরুদ্ধে এফআইআর করল মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সরকারের পুলিশ। ২৩ জুলাই গুনার পিজি কলেজ চত্বরে এআইডিএসও-র উদ্যোগে চন্দ্রশেখর আজাদ স্মরণ অনুষ্ঠানে সামিল হন ছাত্রছাত্রীরা। অনেকে তাঁর জীবন সম্পর্কে নানা পোস্টার তৈরি করে আনেন এবং শহিদের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য দেন। কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকদের কাছে বিপ্লবী আজাদের জীবন সম্পর্কিত বই নেওয়ার জন্য আবেদন জানান তাঁরা। অনুষ্ঠান চলাকালীন বিজেপির ছাত্রসংগঠন এবিভিপি নামধারী কিছু দুষ্কৃতী অনুষ্ঠানে বাধা দিতে শুরু করে। তারা চন্দ্রশেখর আজাদের নামাঙ্কিত পোস্টার ছিঁড়ে দেয়। ছাত্রদের হুমকি দেয়, বিপ্লবীদের স্মরণে এই ধরনের অনুষ্ঠান করলে একেবারে প্রাণে মেরে ফেলা হবে। মধ্যপ্রদেশে শুধু বিজেপির পছন্দের অনুষ্ঠানই করতে হবে। তারা কলেজের প্রশাসনকেও চাপ দেয় চন্দ্রশেখর আজাদকে স্মরণ করার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে হবে। চাপে পড়ে কলেজ প্রশাসনও এই অনুষ্ঠান বন্ধের উদ্যোগ নেয়। পুলিশের কাছে ছাত্রদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে এবিভিপি। এআইডিএসও-র নেতৃত্বে বহু ছাত্র-ছাত্রী থানায় গিয়ে দাবি জানান ছাত্রদের খুনের হুমকি দেওয়ার জন্য এবিভিপি-র বিরুদ্ধে এফআইআর নিতে হবে। তিন ঘণ্টার বেশি ছাত্রদের বসিয়ে রেখে থানার অফিসাররা ছাত্রদের বলেন, ওপর মহলের চাপে এফআইআর নিতে পারছি না। পরদিন ছাত্ররা হনুমান চৌরাস্তায় বিক্ষোভ শুরু করেন। পুলিশ বিক্ষোভ বন্ধ করতে গেলে শহিদের ছবি তুলে ধরে ছাত্ররা তীব্র স্বরে স্লোগান তোলেন। ছাত্রদের দৃঢ়তার সামনে পুলিশ পিছু হটে। প্রবল বৃষ্টির মধ্যেই বিক্ষোভ চলে। সারা শহরে লিফলেট বিলি করা হয়। পুলিশের দলদাস ভূমিকার নিন্দা করে 'ভগৎ সিং ইয়াদগার মঞ্চ'-এর আহ্বায়ক রাকেশ মিশ্রের নেতৃত্বে বিশিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, আইনজীবী, সমাজকর্মীদের এক প্রতিনিধিদল পুলিশ সুপারের সঙ্গে দেখা করে এআইডিএসও-র কর্মীদের বিরুদ্ধে করা মিথ্যা এফআইআর খারিজের দাবি জানান। গুনা শহরে এই আন্দোলন আলোড়ন ফেলেছে।

বিজেপি সরকারের কৃষকবিরোধী একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থ রক্ষাকারী কৃষিনীতি প্রতিরোধে

দেশব্যাপী শক্তিশালী কৃষক আন্দোলন গড়ে তুলতে

এ আই কে কে এম এস-এর আহ্বানে

কিসান মহাসমাবেশ

২৩ সেপ্টেম্বর, বেলা ১২টা

তালকাটোরা স্টেডিয়াম, নয়াদিল্লি

উদ্বোধনী ভাষণ ঃ শংকর ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক, এআইকেকেএমএস

প্রধান বক্তা ঃ সত্যবান, সভাপতি, এআইকেকেএমএস

বক্তা ঃ বেচান আলি, ভি নাগাম্মল, লালবাবু মাহাতো, এম গিরীশ, সোমপাল সিং প্রমুখ এবং এস কে এম নেতৃবৃন্দ

সভাপতি ঃ রঘুনাথ দাস, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, অল ইন্ডিয়া কমিটি, এআইকেকেএমএস

দিল্লিতে আশাকর্মী সম্মেলন

এআইইউটিইউসি অনুমোদিত দিল্লি আশা ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২৩ জুলাই। বিভিন্ন জেলা থেকে আগত আশাকর্মীরা সম্মেলনে অংশ নেন। দীর্ঘ সময় ধরে আশা কর্মীদের নানা সমস্যা ও দাবি নিয়ে আলোচনা হয় ও আন্দোলনের কর্মসূচি নির্ধারিত হয়। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ঊষা ঠাকুর, সহসভাপতি প্রকাশ দেবী বক্তব্য রাখেন। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্কিম ওয়ার্কার্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার সাধারণ সম্পাদক ইসমত আরা খাতুন ও দিল্লি রাজ্যের শ্রমিক নেতৃবৃন্দ। সম্মেলন থেকে শিখা রানাকে সভাপতি, ঊষা ঠাকুরকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে ৫০ সদস্যের রাজ্য কমিটি গঠিত হয়।

শিবদাস ঘোষ স্মরণে বাঁকুড়ায় আলোচনা সভা

শিবদাস ঘোষ মেমোরিয়াল কমিটি, বাঁকুড়া শাখার পক্ষ থেকে ২৫ জুলাই বাঁকুড়া মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের প্রেক্ষাগৃহে এ যুগের মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের স্মরণ দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। কমরেড শিবদাস ঘোষের জীবন-সংগ্রাম এবং বর্তমান সময়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যা সমাধানে শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা কী ভূমিকা পালন করতে পারে— এই বিষয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপক কুন্তল সিনহা, প্রাক্তন ব্যাঙ্ক ম্যানেজার সুবোধ সিংহ, সরকারি কর্মচারী বিশ্বজিৎ ঘোষ, ছাত্র সাধন রজক, স্বাস্থ্যকর্মী অমৃত দে এবং দেবাশীষ দত্ত, শিক্ষক সুদর্শন পাল প্রমুখ। প্রধান বক্তা ছিলেন ডাঃ সজল বিশ্বাস। সভাপতিত্ব করেন ডাঃ নীলাঞ্জন কুণ্ডু এবং ডাঃ সুভাষ মণ্ডল। সঞ্চালনা করেন শিক্ষক রঞ্জিত মাহাতো।

সভায় ৪০ জন উপস্থিত ছিলেন। দেবাশীষ দত্ত প্রস্তাব দেন, শিবদাস ঘোষের জীবনী স্কুল-পাঠ্য করার জন্য কমিটির উদ্যোগী হওয়া দরকার। স্বাস্থ্যকর্মী জয়ন্ত পাল প্রতি মাসেই কোনও না কোনও মনীষীর জীবন চর্চা করার প্রস্তাব রাখেন।

জুনপুটে ক্ষেপণাস্ত্র কেন্দ্রের প্রতিবাদে গণবিক্ষোভ

কাঁথির উপকণ্ঠে জুনপুটে হাজার হাজার মৎস্যজীবী ও গ্রামবাসীকে জীবন-জীবিকা থেকে উচ্ছেদ করে ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ কেন্দ্র এবং হরিপুরে পরমাণু চুল্লি স্থাপন করার সরকারি প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ২৪ জুলাই এস ইউ সি আই (সি) দলের নেতৃত্বে কাঁথি শহরে মিছিল করে মহকুমা শাসক দপ্তরে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। দলের পূর্ব মেদিনীপুর দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক অশোকতরু প্রধান বলেন, যদি ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ কেন্দ্র করতেই হয়, তা হলে অন্য কোনও জনবিহীন স্থানে করা হোক। কিন্তু কোনও ভাবেই হাজার হাজার মৎস্যজীবী ও সাধারণ মানুষের রুটি রুজির অধিকার কেড়ে নিয়ে তাদের ভিটে মাটি থেকে উচ্ছেদ করে জুনপুটকে সামরিক ঘাঁটি বানানো চলবে না। তিনি বলেন, জুনপুটে হরিপুরে পর্যটন কেন্দ্র এবং মৎস্য সংরক্ষণ শিল্প হোক। উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য উৎপল প্রধান, মানস প্রধান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। দলের কর্মী-সমর্থকরা ছাড়াও বহু সাধারণ মানুষ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

গ্রামে গ্রামে জনবিরোধী বাজেটের প্রতিলিপি পোড়ালেন কৃষকরা

সারা দেশের সাথে পশ্চিমবাংলার গ্রামে গ্রামে এ আই কে কে এম এস-এর উদ্যোগে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের কৃষক ও শ্রমজীবী জনগণ বিরোধী কর্পোরেট স্বার্থবাহী কালা বাজেটের প্রতিলিপি পোড়ানো হয় ২৬ জুলাই। গ্রামে গ্রামে কৃষক-খেতমজুররা দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতি শ্রেণি ও তাদের সেবক কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান তোলেন। হাজার হাজার কৃষক-খেতমজুর এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

Editor : Amitava Chatterjee ■ Printed & Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. ■ 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com